ছিটে-ফোঁটা

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার

7242.

81 - 7242

5142

ছিটে-ফোঁটা

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

জীবন-বাণী, থেরীগাথা, হেঁয়ালি প্রভৃতি রচয়িতা

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীপ্রমথনাথ সেন, বি. এল্.

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মূল্য বার আনা

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী

কালিকা প্রেস

২০, ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পরিচয়

ছোট-ছোট কয়েকটি গল্প আছে, হাসি-তামাসার গদ্য-পদ্য রচনা আছে, আর গোটাকতক গুরু তথ্যকে লঘু পথ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

'ব্যর্থ'-রচনাটি আমার নয়,—আমার দুহিতা সুনীতি দেবীর। এটি বঙ্গবাণী মাসিক পত্রে যখন প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন পাঠক-মহলে উহা প্রশংসিত ও আদৃত হইয়াছিল।

নিছক হাসি-তামাসা ছাড়া যে কয়েকটি ব্যঙ্গ রচনা আছে, তাহাদের সম্বন্ধে বিদেশের Francis-এর উক্তিটি তুলিতেছি :

Ridicule shall frequently prevail
And cut the knot when graver reasons fail.

কি-কি আছে

ছিটে-ফোঁটা

খেয়ালি

এক যে ছিল নেলা-খেপা এক-বগ্‌গা খেয়ালি,
কর্‌ত শুধু রচনা সে—নিত্য নূতন হেঁয়ালি।
দেখ্‌লে তাকে আঁচলমুখে হাস্‌ত যত স্ত্রীলোকে ;
বালক ছাড়া কেউ ছিল না শ্রোতা তাহার ত্রিলোকে।
শোলোক পড়ে' কর্‌লে প্রশ্ন, দিত না কেউ উত্তর-ই,
যুবায় কর্‌ত উপহাস, বুড়ায় বল্‌ত—ধুত্তোরি!
বস্‌ত ঘিরে ছেলে-পিলে, শুন্‌ত ধাঁধা গা-করে',
জুট্‌ত নাক জবাব কিছু, থাক্‌ত মিছে হাঁকরে।
পড়্‌ল কবি—মানুষ কেন হাঁপিয়ে মরে কর্মে গো ?
না থাক্‌লেও মাথা, কেন মাথার ব্যথা জন্মে গো ?
বল্‌লে একটা দুষ্ট ছেলে—উল্টা কেন অবস্থা—
'দিনের বেলায় কাজ-কর্ম, রাত্রে শোয়ার ব্যবস্থা ?
ধাঁধা গেল উড়ে পুড়ে পরিহাসের দহনে ;
মনে হ'ল বৈরাগ্য, কবি গেলেন গহনে।

ভাব্‌ল কবি—মানুষগুলা ঘরে কেন বন্দী রে ?
দেবতা কেন শেওড়া গাছে, ভূতের বাসা মন্দিরে ?
আওড়াতে সে মন্ত্রটুকু, অস্তে গেলেন সবিতা ;
নেমে এলেন বনদেবী শুন্‌তে ধাঁধার কবিতা।
দেবীর মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে খেয়ালি
জিজ্ঞাসিল প্রশ্নে তাকে সদ্য-রচা হেঁয়ালি।
প্রশ্নে কহে ধাঁধার কবি, নত করে জানু সে—
দেবের ভাগ্যে দুঃখ কেন, সুখী কেন মানুষে ?
দেবী কহে—ধাঁধা সবই, এস কবি খেয়ালি !
আঁধার পারে দেখ্‌বে ধাঁধা, তারার ঘরে দেয়ালি।
সাপের যেন ছুঁচা-গেলা, মাছের গেলা বঁড়শি গো !
উড়্‌ল কবি ; খুঁজ্‌ল না তায় কোন পাড়া-পড়সি গো।
দেখ্‌ল কবি নূতন ধাঁধা লেখা তারার কাম্‌রাতে—
বুকের পাড়ে দুখের বাসা, সুখের বাসা চাম্‌ড়াতে।

ব্যর্থ

দুজনে দেখা,—নিভৃত নিকুঞ্জে নয়, পুষ্পিত লতাবিতানে নয়, স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণীর তীরে নয়, ফেনোচ্ছ্বাসময় সাগরতীরে নয়, অভ্রভেদী গিরিশিখরেও নয়,—কল্‌কাতার একটা ঘুপ্‌সি গলির মধ্যে একটা সেঁৎসেঁতে বাড়ীর উঠানে।

দুজনে দেখা হ'ল—শারদ প্রাতে নয়, মাধবী রাতে নয়, অরুণের রক্তিমা কি সন্ধ্যার ম্লানিমায় নয়, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না বা অমাবস্যার কালিমাতেও নয়। তখন বাবুরা অফিসে গেছেন, ছেলেরা স্কুলে গেছে, ছোট ছেলে-মেয়ে কোলে করে' বৌ-এরা কেউ-বা ঘুমুচ্ছেন, কেউ-বা বটতলার একখানা বই পড়ছেন্‌, কেউ-বা চুড়িওয়ালা ডাক্‌বেন বলে রাস্তার ধারের জান্‌লার খড়খড়িটা খুলে দাঁড়িয়ে আছেন,—এমন এক মধ্যাহ্নে তাদের দুজনার দেখা হ'ল।

তারা রবিবাবুর গান কখনও গায়নি, পড়েওনি, কিন্তু দেখা হ'তেই দুজনে—থমকি থেমে গেল পথমাঝে।

কে বলে—চোখের ভাষা নেই! সেই-যে তারা চোখে-চোখে চেয়ে রইল, কত প্রশ্নই ফুটে উঠ্‌ল! একজনের চোখ জিগ্‌গেস্‌ করলে—কে তুমি? আমি ত রোজ আসি; কই, তোমায় ত দেখিনি? অন্য জনও সেই কথাটাই মৌনভাবে জিগ্‌গেস্‌ করলে—তাইত! তুমিই বা কে? আমি যে প্রতিদিন এখানে আসি—তোমার সঙ্গে ত দেখা হয়নি একবারও!

ভাগ্যবিধাতা অন্তরালে হেসে বল্‌লেন্—এক মুহূর্ত আগু-পিছু আসা-যাওয়াতে যে দুজনের দেখা হয় না, সে আমারই কারসাজি। আজ যে দেখা হ'ল, এও আমারই খেলা।

তারা দুজনে কখনও সংস্কৃত কাব্যের প্রেমের লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করে নি; কিন্তু কয়েক মুহূর্ত চোখের মিলনের পরই স্তম্ভ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি লক্ষণ ধীরে ধীরে তাদের শরীরে দেখা দিল।

তারা দুজনেই দুজনের দিকে এগিয়ে এল। এবার আর চোখের ভাষায় চল্‌ল না; সে ভাষা শব্দে প্রকাশ পেল······।

ঠিক এই সময় একটি মেয়ে—বছর বার হবে—ওপরের বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—ও বৌদি, এদের কাণ্ড দেখে যাও। এবার ধরা পড়েছে ওদের বিয়ে।

বৌদি এসে দেখে বল্‌লেন্—আ গেল যা। দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্ কি? মরতে আর জায়গা পায়নি ওরা, এখানে এসে রঙ্গ দেখান' হচ্ছে!

কথার সঙ্গে-সঙ্গে দোতলা থেকে একখানা ঝাঁটা ঝুপ্ করে তাদের দুজনের ঘাড়ে পড়ে সেদিনকার মত এই মনোরম নাট্যের রসভঙ্গ করে দিল। উঠানরূপ রঙ্গমঞ্চ থেকে মাছের কাঁটার অধিকার সাব্যস্ত করা ফেলে তারা দুজনে দুদিকে বেগে প্রস্থান কর্‌ল।

যাওয়ার সময় একজন রোমাঞ্চিত শরীরটাকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে শব্দ করে উঠ্‌ল—ম্যেও! অন্যজন আরও একটু ফুলে উঠে অপর প্রান্ত থেকে উত্তর দিল—ফ্যোঁস্!

তত্ত্ব কথা

সৃষ্টি তখন টাট্‌কা কচি, জন্মেনিক মুনিঋষ্যি,
দেবতাদের অল্প বয়স, আঠার বা উনিশ-ই।
লক্ষ্মী আছেন রান্নাঘরে, তৃপ্তি দিতে শ্রীনাথে,
সরস্বতী বাজাচ্ছিলেন প্রেমের দীপক বীণাতে ;
বিষ্ণু হলেন ধ্যানে মগ্ন সন্দেহটির ভঞ্জনে—
কিসে বেশি রসের মাত্রা—গুঞ্জনে না ব্যঞ্জনে।
ঘন-ঘন বাজ্‌ল বীণা পঞ্চবাণের অর্চনে।
সম্ভারটি পড়্‌ল ডালে, পাঁচ-ফোঁড়নের তর্জনে।
ছাপিয়ে ছন্দ রাঁধার গন্ধ বাতাসটুকু রসিল ;
নাকের-ই ভিতর দিয়া মরমে সে পশিল।
সেদিন থেকে লক্ষ্মী হলেন সবার চেয়ে আদুরে ;
গীতি-প্রীতির চেয়েও হ'ল নৈবিদ্যি স্বাদু রে।

স্বপ্নের একফোঁটা

(অনূঢ়ার বাণী)

(১)

অমাবস্যার রাত্রি যখন তাহার সারা মসৃণ অঙ্গের নির্য্যাস-রসে দীপ্তির প্রথম বিকাশকে মনোহর করিতেছিল আর ফোটাইয়া তুলিয়াছিল পূর্বের আকাশের শুক তারাকে, তখন বিহ্বল জাগরণের স্পর্শে আমার নৈশ স্বপ্ন,শরতের তরল মেঘের মত আকাশে-আকাশে ছড়াইয়া পড়িল। রেখায়-রেখায় ফুটিয়া উঠিল আমার চেতনার নূতন রশ্মি। অন্ধকারের কোমল আলিঙ্গনে সুপ্ত ছিল আমার বেদনা ; আমার জাগরণে হইল তাহার নূতন উদ্বোধন। আমার চেতনা ও বেদনা হইল স্বপ্নসিক্ত ও আলোকলিপ্ত।

(২)

আমি তুচ্ছ নই, আমি উচ্চ। কে আমায় বলিবে অনাথা ! যৌবনের জন্মে আমার যে প্রেম নবনির্ঝরে উৎসরিল, তাহার একটি বিন্দু—একটি কণাও কাহাকেও স্পর্শ করিল না। নির্ঝরের তলায় যে ধারা বহিল, সে ত অপরের প্রাণের ধারায় আত্মহারা হইয়া ছুটিল না, কেবল অন্তরের মূলে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া অস্ফুট কলধ্বনি তুলিল। অপরের প্রাণের মিলনে যৌন প্রেমের স্রোত না বহিলে কি জীবন নিষ্ফল হয় ? গাঢ় তিমিরের মত আমার এই অঙ্গের কালিমা—এই কৃষ্ণ বর্ণ কাহারও চোখে মনোহর হয় নাই। আমি নিভৃতে আমার নিবিড় অন্ধকার নিংড়াইয়া

প্রভাতের দীপ্তি রচিয়াছি আমার নিজের আনন্দে। আমি শুক্রের মত ফুটাইয়াছি আমার মানস-চেতনা। আমার এই অনাঘ্রাত অস্পৃষ্ট অঙ্গে ঝরিয়া পড়ুক শুক্রের দীপ্তি। আমি সেই শুচির আনন্দে বিশ্বকে বন্দনা করি। আমার স্বপ্নের ক্ষুদ্র চেতনায় জড়াইলাম তাহার দুই-একটি শিশির-সিক্ত ফোঁটা। শুক্রের আলোকে ঝলকিয়া উঠিল সেই স্বপ্ন-কণিকা; আর তাহার গায়ে মিশিয়া গেল অজানা পাখীর প্রথম-প্রবুদ্ধ স্বরের কম্পন।

অন্ধকারে উদ্ভাসিত শুক্রের মত আমার প্রাণ হইল আমার কাছে মনোহর; আলোকের এক ফোঁটা, চেতনার রন্ধ্রে ঝলসিয়া উঠিল!

(৩)

যে শোভা দৃষ্টির পরিসরে পরিমিত অথবা আয়ত্তপ্রায়, তাহাকেই সুন্দর বলি; আর যাহা অই সুন্দরের অতীত, যাহা অনুভূতিতে জাগায় অপরিমিত আকর্ষণ, তাহাকে সুন্দর আখ্যা দিতে পারি না,—তাহা কেবল মনোহর। আমার রূপ এজগতে কাহাকেও চঞ্চল করে না। আমি মনোহরও হইতে পারি না। কিন্তু আমি অন্ধকার-নিঃসৃত অন্ধকার-মিলিত শোভায় আজ মনোহরকে দেখিয়াছি। আমি কি আমার অন্ধকারে আনন্দের প্রদীপ জ্বালাইয়া আমাকে বিশ্বের অনুভূতিতে মনোহর করিতে পারিব না! আমার শিশিরসিক্ত স্বপ্নের ফোঁটা রৌদ্র-তপ্ত ধরাকে শীতল করুক! আমি সন্তপ্তের শরণ হই, মূর্চ্ছিতের চেতনা হই, জগতের শুষ্কপ্রায় প্রাণের সন্ধিতে-সন্ধিতে রসের বিন্দু হই; অপরের কাছে মনোহর না হইয়া বিশ্বকে আমার অনুভূতিতে মনোহর করিয়া আপনার চেতনায় মনোহর হই।

(৪)

সকল গাছেই ফুল ফোটে না ; তাই বলিয়া অপুষ্পক তরু-লতার জীবন নিষ্ফল নয়। সৃষ্টির কি প্রয়োজন সাধিবার জন্য মানুষের জন্ম, তাহা জানি না ; তবে আমার জীবন-গতির কম্পন নিয়ত অসীমের ইঙ্গিতে উদ্বেলিত। কোন অবসানের নিশ্বাস আমাকে স্পর্শ করে নাই, আমি সৃষ্টির রহস্য বুঝি নাই, কিন্তু সেই নিগূঢ় অজানা রহস্যের উপর আমার চিরস্থির অফুরন্ত বিশ্বাস শূন্য ব্যোমে অভাব-বোধের বেদনার তরঙ্গ অবিরত উচ্ছ্বসিত হইতেছে, আর বিদ্যুৎকুঁড়ির মত অগণিত ভাবের বীজ উদ্ভূত হইয়া নিত্য নূতন-নূতন অণু-পরমাণু গড়িতেছে। আমি অসীম বিশ্বের মধ্যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিশ্ব রচনা করিতেছি। এক ফোঁটা স্বপ্নের দাগে আমি ও আমার কর্ম অঙ্কিত। এ জীবনকে কেহ চাহিতেছে না, তবুও নিগূঢ় আকর্ষণে যেন সকলেই চাহিতেছে। সেই আকর্ষণে আবর্তিত হইয়াই আমার জীবনলীলা ধন্য হউক।

(৫)

এই যে আমার চেতনা অন্ধকারের কোমল শয্যায় শায়িত, স্বপ্নে পুষ্ট, শুক্রের আলোকে উদ্ভাসিত, আর বিশ্বের রন্ধ্রপথে অসীমে ধাবিত, উহার প্রসারিত পাখার পালকে-পালকে যে চঞ্চলতা জাগিতেছে সেই আমার যৌন প্রেমের পরম বিকাশ। উহা দুঃখ, না মৃত্যু, না আনন্দ, তাহা বুঝিবার ক্ষমতাও নাই, অবকাশও নাই। সারা জীবনের সকল গতির যুক্ত ধারা আপনার উচ্ছ্বাসের আনন্দে আপনি বিহ্বল হইয়া ছুটুক। আমি স্বপ্নের আনন্দে ও শুক্রের আকর্ষণে অনির্দিষ্ট লোকে ভাসিয়া যাই।

নববর্ষ

মরি বুড়ার রঙ্গ দেখে! নাই কি লজ্জা আদপে?
এলে তুমি ছেলে সেজে সঙ্গে নিয়ে মাধবে!
ভোল্ ফিরিয়ে সৃষ্টি কর—নিত্য নূতন রহস্য!
কুঞ্জতলে যত কচি খোকা তোমার বয়স্য।
যতই ভুলাও, যতই খেলাও, মিলে দুটি সখাতে,—
চিনি তোমায় হে বুড়া শিব, পারবেনা-ক ঠকাতে।
মঞ্জু-বনে সেই পুরাতন সঞ্জীবনী স্পর্শরে।
গড় করি গো বুড়া ঠাকুর তোমায় নূতন বৎসরে।

জীবনে দুঃখ কেন?

ভাবিয়া পাইনা—মানুষেরা মরে কেন? এমন আকাশ, এমন বন-পাহাড়, নিসর্গ-সুন্দরীর এমন লীলা, প্রীতি ও হাসির এমন খেলা—মানুষেরা ছাড়িয়া যায় কেন? কি বলিলে? একটা পরপার আছে, আর সেখানকার সৌন্দর্য্য অধিকতর মধুর? এই নিতান্ত অপ্রমাণিত শোনা-কথা না-হয় মানিতাম, যদি তাহাতে তোমাদের বিশ্বাস থাকিত। অধিকতর সুখের দেশের লোভে তোমরা ত যখন-তখন টপাটপ্ গলায় দড়ি দাও না! কেবল যখন মজা জোটেনা তখনই পেঁচার মত মুখ করিয়া হাই তুলিয়া সুর ধর—"তারা কোন অপরাধে" ইত্যাদি।

তুমি বলিতে চাও—প্রথমে আমার প্রশ্নটাই ভুল, আর তাহার পর, আমার নিজের তর্কেই আমি আঁচ দিয়াছি যে, মানুষেরা বোকা বলিয়াই মরে না—মরণ আসে বলিয়া দায়ে ঠেকিয়াই মরে। তোমার অন্য তর্ক এই—প্রকৃতি নিখুঁত সুন্দরী নয়, আর হাসি ও ভালবাসার চেয়ে কান্না ও শত্রুতা কম নয়। আগে তোমার শেষ কথাটির উত্তর দিব।

বেদনা না থাকিলে তোমার চেতনাই হইত না ; যে 'অপরের' আঘাতে আপন ও পর চেনে নাই, সে ত জড়ের সঙ্গে একাকার হইয়া আছে। যাহার সংজ্ঞাই নাই তাহার আর বাসনা কোথায় ? দার্শনিকেরা আমাদের বুঝিবার ক্ষমতাকে অর্থাৎ অনুভূতিকে বলিয়াছেন বেদনা। তুমি আছ আলাদা, আমি আছি আলাদা, অন্য পদার্থ আছে আলাদা, তাই আমি বুঝিতে পারি একটা 'আমি'। তুমি চাও ফাঁকি দিয়া মরিয়া মুক্তি পাইতে, অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাগরে লীন হইতে, অর্থাৎ জলে জল হইতে। তাহা হইলে তোমার কেহ অপর রহিল না, দেখিবার কিছু রহিল না,—অর্থাৎ কিনা হইলে অনুভূতিশূন্য খাঁটি জড়। বেদনা নাই, দুঃখ নাই, অথচ তুমি আছ—এটা কথার ফাঁকি।

ক্ষুধা আছে, বাসনা আছে,—তাই ছট্‌ফটানি আছে, তাই আমি তোমাকে খুঁজি, তাই দশে মিলিয়া সমাজ বাঁধি। যদি ওসকল জ্বালা না থাকিত অথচ শরীর থাকা সম্ভব হইত, তবে কেহ কাহাকে খুঁজিত না, চেতনায় কৌতূহল জন্মিত না, অনুরাগ জন্মিত না, আনন্দ জন্মিত না,—আমরা হইতাম জড়ের বাড়া—সচেতন জড় ; যদি জড়ত্ব না চাও, তবে দুঃখ উড়াইতে চাও কেন ? ব্রহ্মে লীন হইতে চাও কেন ? 'তুমি'-ই যদি না রহিলে তবে দুঃখ থাকিল আর না-থাকিল, তাহাতে তোমার কি !

শত্রুতার কথা বলিয়াছিলে। আগেই কথাটার আঁচ দিয়াছি,—আঘাত আছে বলিয়াই চেতনা আছে ; পেটের ও প্রেমের ক্ষুধা আছে

বলিয়াই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, আর সুখ ও আনন্দ নামক পদার্থকে পাইয়াছ ও চিনিয়াছ। তুমি গাছের পাকা ফলরূপে আনন্দ চাও, কিন্তু যে গাছে উহা ফলে, সে গাছ চাওনা। তুমি এমন একটা সুখ বা আনন্দের নাম করিতে পার কি, যাহার জন্ম অই ক্ষুধা-দুইটির বংশে নয়?

শত্রুর আঘাতে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিতে আমার বুদ্ধি বাড়ে, আর আমি শক্ত হইতে শিখি ও হাতিয়ার সৃষ্টি করিয়া একটা কিছু সৃষ্টি করিবার আনন্দ ভোগ করি। তাহা ছাড়া আবার লড়াই করিতে-করিতে পরের দেশের পরকে চিনি, পরের বুদ্ধি দেখিয়া বুদ্ধি বাড়াই, আর পরিশেষে আমার ও পরের স্বার্থ এক হইলে, পরকে টানিয়া আপন করি ও সমাজের প্রসার বাড়াইয়া জ্ঞান বাড়াই। যেখানে যুদ্ধ নাই, সেখানে খাঁটি মিল আসিবে না; যেখানে তুমি ও আমি নির্বিরোধে আলাদা-আলাদা, সেখানে আছে জড়বুদ্ধির উদাসীনতা,—আর সে উদাসীনতাকে মিল বলিতে পারি না, অথবা আনন্দের অবস্থা বলিতে পারি না। যদি পার, আমার সঙ্গে ফাঁকির তর্ক না করিয়া যুদ্ধ কর।

কি বলিলে? ক্ষুধা-তৃষ্ণা না-হয় থাকে থাক্, কিন্তু ঈশ্বর মরণ দিলেন কেন? তুমি যদি জানিতে—কোনও ব্যাধি তোমাকে ক্ষয়ের দিকে টানিবে না, অথবা কোনও আঘাতে তোমার নিপাত নাই, তবে ত তুমি মুর্শিদাবাদের কুড়েদের মত পিঠ পুড়িলেও ঘরে আগুন-লাগা অগ্রাহ্য করিয়া ঘুমাইতে। আঘাতে তোমার চেতনা হইত না আর আত্মরক্ষার ছট্‌ফটানিতে তোমার বুদ্ধি ও আনন্দ বাড়িত না।

আর একটি কথা আছে। মানুষ যদি জানিত—সকল ঝড়-তুফান সহিতে হইবে, আর সে সহিবার দুঃখের শেষ নাই, পিতামহ ব্রহ্মা ও বিদেশী মেথুসেলার মত সকল দুঃখের দ্রষ্টা হইতে হইবে, ও গ্রীকদের

প্রমিথিউসের মত পাহাড়ে বাঁধা পড়িয়া কেবল কশাঘাত খাইতে হইবে, তবে আমরা বিধাতার কাছে তাঁহার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদরূপে মরণ প্রার্থনা করিতাম না কি? আমার নিজের তর্কে নিজেই হারিয়াছি? তুমি বলিতে চাও, মরণটা যে শরীরী প্রকৃতি, আর মরণ আছে বলিয়াই যে এ সংসারে সুখ আছে, আমি সেই কথা সাব্যস্ত করিয়া, নিজের গোড়ার প্রশ্ন নিজেই কাটিয়াছি? মুখ ভেঙ্‌চাইতেছ কেন? তুমি কি বলিতে চাও, অনেক আষাঢ়ে গল্প শুনিয়াছ, কিন্তু এমনতর আষাঢ়ে তর্ক শোন নাই?

পাঁচালি

নিজের চেয়ে পরই ভাল যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে ;
বীরের চেয়ে ভীরু ভাল পরিহাসে ঘাঁটাতে।
খাওয়ার চেয়ে উপোস ভাল ভোজের দিনে প্রভাতে ;
আস্ত থেকে ছেঁড়া ভাল—জুতা, দেশী সভাতে।
সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল ঘটে যদি বরাতে ;
বিয়ের চেয়ে শ্রাদ্ধ ভাল, বৃদ্ধ জনে তরাতে।
পাওনা থেকে দেনা ভাল দাবি হলে তামাদি ;
চিন্তা হ'তে ধিন্‌তা ভাল শিখে' সা-রে-গা-মা দি।
টাকার চেয়ে কড়ি ভাল দিতে দানে দক্ষিণায় ;
কর্মী থেকে বক্তা ভাল, মাথার উপর ঝক্কি নাই।

ঘরের চেয়ে প্রবাস ভাল জুটলে নিত্য আতিথ্য ;
গুরুর চেয়ে লঘু ভাল গড়্‌তে মাসিক সাহিত্য।
সোজার চেয়ে উল্টা ভাল, পদ্যে কথা জড়াতে ;
কহে নব দাশরথি, এই পাঁচালির ছড়াতে।

কানাই-বলাই

(ত্যাগ-স্বীকারের মনোহর গল্প)

আমাদের গ্রামের লোকেরা বলিত—কানাই চক্কত্তি ছিল ধর্মিষ্ঠ সাধু, আর বলাই ঘোষ ছিল পাপিষ্ঠ, বেল্লিক। কেন এক-একজনের নামে সুখ্যাতি বা অখ্যাতি রটে, তাহাই এই গল্পে লিখিব।

কানাই ও বলাই দুইজনেই বাপ্‌-ঠাকুরদাদার সম্পত্তি পাইয়াছিল অনেক ; রোজ্‌গারের ভাবনা ছিল না। যে ধরণের দরাজ গলায় কাঁদুনে সুরের ঢেউ খেলিলে কীর্তন গাইবার উপযোগী হয়, কানাই-এর গলায় সেই সুর ছিল ; সে অনেক আখ্‌ড়া মাতাইয়া গাইত—আমি মরিব, মরিব সখি। অন্যদিকে বলাই তাহার সরু গলায় আসর জমাইয়া গাইত—ডুবেছ ত ডুবে দেখ। এ গেল তাহাদের গান কপ্‌চাইবার প্রথম যুগের কথা।

পরে যে কিসে কি হইল, তাহার খাঁটি ইতিহাস মেলে না ; তবে ইহা জানি যে, একদিন কানাইকে টানিলেন স্বর্গের হরি, আর বলাইকে টানিল পাড়ার পাপিষ্ঠা হরিমতি। দুইজনেরই বাঁধা সংসার ছিল,—

স্ত্রী-পুত্র ছিল ; আর দুইজনেই নিজেদের ত্যাগের বুদ্ধিতে ঘর-বাড়ী ও স্ত্রী-পুত্র ছাড়িল। কানাই চেঁচাইয়া সংস্কৃত আওড়াইয়া বলিত—কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ ; বলাইও ঠিক তাহাই বলিত, তবে নিজের মনে-মনে, বাংলা ভাষায়।

দুইজনেরই ঘর-সংসার উড়িয়া-পুড়িয়া গেল ; কানাইএর সম্পত্তি উড়িল ভক্ত-পুষ্টির মালসা-ভোগে, আর বলাই-এর সম্পত্তি উড়িল নক্ত-তুষ্টির পর সালসা ভোগে।

কানাই পৃথিবীর কোন লোকের সঙ্গে কথা কহিত না ; হয় ঊর্দ্ধ-নয়নে, না-হয় চোখ বুঁজিয়া হরি-মন্দিরের দেওয়াল ঠেসান্ দিয়া চব্বিশ ঘণ্টা কাটাইত ও মাঝে-মাঝে তাহার—তনু হ'ত রোমাঞ্চিত, প্রেমরসে বিগলিত। বলাই-এর চব্বিশ ঘণ্টার বিবরণে অইরূপ কিছু ছিল কি-না, তাহার সাক্ষী নাই। তবে সে হরিমতির বাড়ী ছাড়িয়া পাদমেকম্ কোথাও যাইত কি-না সন্দেহ।

একই ত্যাগ-নদীর দুইটি ধারা কানাই-বলাই শেষে মায়াময়-মিদমখিলং হিত্বা কোথায় বিলীন হইয়া গেল ! শোনা যায়—বলাই-এর ছেলেরা পাপিষ্ঠা হরিমতির কাছে তাহার পাপের টাকা কিছু পাইয়াছিল। কিন্তু হরি-মন্দিরের পুণ্যাত্মা অধিকারী কানাই-এর পরিবারের কাহাকেও পাপময় সাংসারিকতার তিলমাত্র প্রশ্রয় দেন নাই। হরিমতি কিছু দিল, কিন্তু হরি কিছু দিলেন না কেন, এই পাপ কথা একবার কানাই-এর স্ত্রী বলিয়াছিল, আর তাহা শুনিয়া মন্দিরের অধিকারী ঠাকুর কানে আঙ্গুল দিয়া বলিয়াছিলেন—হরি বল, হরি বল, হরি বল।

বছর চলে

বছর চলে বর্ষাজলের ঢলের মত ;
নয়ত খেলায় পায়ের ঠেলায় বলের মত।
কালের বায়ু দোলায় আয়ু নলের মত,—
সরু বোঁটায় পাকা মোটা ফলের মত।
চল্‌ছে শরীর বটে, ঘড়ির কলের মত,
কিন্তু যমে ভাঙ্‌ছে ক্রমে খলের মত।
প্রাণে হতাশ, উদাস আকাশ— তলের মত ;
দাঁড়িয়ে আছি ভোজের বাজির ছলের মত।
রইব ধরায় ফুলের ঝরা- দলের মত ;
শুষ্ক তরু, নয়ত মরু- স্থলের মত।

স্বদেশী চাকুরির কাহিনী

লোকে বলে আদালতে ডিক্রি পাওয়া বরং সোজা, ডিক্রিজারি করা বড় কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাওয়া বড় কঠিন হয় নাই তবে উহা জারি করিয়া কাজ হাসিল করিতে গোল বাধিল। বসন্ত কালটা কাটিয়া গেল জয়ের আনন্দে ও ফুলের গন্ধে, আর গ্রীষ্ম কাটিল মন্দ নয়—শ্বশুর-বাড়ীর আমে ও সন্দেশে। তাহার প আষাঢ়ের দীর্ঘ বেলা আর কাটে না! কেমন করিয়া কৃতিত্বের ঝলকে পরীক্ষককে চম্‌কাইয়াছিলাম, সে আষাঢ়ে গল্প প্রতিদিন শোনাইবা

শ্রোতা জুটিল না। জগন্নাথের রথের মত আমার রথ টানিবার ভক্ত না জুটিলেও কোন-মতে গড়াইয়া-গড়াইয়া একমাস পাড়ি দিলাম। শ্রাবণের প্লাবনের সময় অনেক উপদেষ্টা মুরুব্বির মন্ত্রণার স্রোতে ভাসিতে লাগিলাম,—কূল পাইলাম না। ভাদ্র মাসের পানকৌড়ি যেমন শিকারীকে এড়াইয়া শিকার ধরিবার জন্য ডুবিয়া-ডুবিয়া বেড়ায়, আমিও সেইরূপ অযাচিত উপদেশ এড়াইয়া অনেক চাক্‌রি খুঁজিয়া নানাস্থানে গিয়া হয়রান্ হইলাম। তাহার পর জগদম্বার কৃপায় আশ্বিন মাসটা কাটিয়াছিল ভাল ; বহু উপচারের প্রসাদ খাইয়া পুষ্টি পাইলাম।

ভাবিতেছিলাম—কি উপায়ে এই পুষ্টিকে ক্ষয়ের হাত হইতে বাঁচাই ;—এমন সময়ে জগদম্বার উৎসবের চেয়েও উপভোগ্য ভোটের উৎসব আসিল। কপালক্রমে আমার একটা ভোট ছিল ; আমি সেটার সদ্ব্যবহার করিবার সুবিধা পাইলাম। তিনজন ভোট-প্রার্থীকেই আশ্বস্ত করিয়া ও তাঁহাদের জন্য খাটিবার ছল করিয়া সুখে ঘুরিলাম অনেক, ও পোলাও-সন্দেশ খাইলাম ঢের। তাহার পর ভোটের বিজয়োৎসবের দিন গোলেমালে হরিবোল দিয়া কাহাকেও অসন্তুষ্ট না করিয়া ভরাপেটে ঘরে ফিরিলাম।

ভোটের আসরে বিনাপয়সায় খবরের কাগজ পাইয়াছিলাম ; বাড়ী আনিয়া পড়িয়া দেখি—আর এক শুভযোগ উপস্থিত। কুম্ভমেলার শুভযোগের জন্য কর্মীর খোঁজ হইতেছিল ; আমি নির্বিবাদে জুটিয়া গেলাম। ভোটের উৎসবে হিতৈষণার বক্তৃতার ঢং শিখিয়াছিলাম,—উহা খুব কাজে লাগিল। ভবিষ্যৎ যাত্রীর দুঃখের জন্য কাঁদিলাম, পরে খাইলাম ও খাওয়াইলাম, বিনাপয়সায় অনেক দেশ দেখিলাম, ও পথের ঘাটিতে-ঘাটিতে অনেক চাক্‌রির সন্ধান নিলাম। একদিন দলের ভিতর হইতে সট্‌কিয়া একটি বিলাতি খাদ্যের হোটেলে ঢুকিয়া একজন

ধনীর উপহারের টাকায় অনেক সুখাদ্য 'অখাদ্য' খাইলাম ও একজন অর্দ্ধ-পরিচিতের কাছে অনেক চাকুরির সন্ধান নিলাম। একজন ছদ্মবেশী টিক্‌টিকি সাহেব অদূরে বসিয়া আমাদের কথাবার্তা শুনিয়াছিলেন। আমি যখন আহারের পর গায়ে একখানি গেরুয়া জড়াইয়া সেদিনকার গোরক্ষণী সভার এক অধিবেশনে গৌ-মাতা ও ষাঁড়-পিতা বিষয়ে ওজস্বিনী বক্তৃতা করিতেছিলাম, তখন টিক্‌টিকি সাহেব সেখানে ছিলেন। আমার গোজাতির প্রতি অনুরাগের বিষয়ে সাহেবের সন্দেহ ছিল না; বক্তৃতার পর তিনি আমাকে গোপনে ডাকিয়া সেদিন ও তাহার পরে অনেক কথা বলিয়া আমাকে টিক্‌টিকির দলে টানিলেন। আবার বসন্ত আসিল,—এবার আমার সুখের বসন্ত।

কোর্ট্‌শিপ

তোমায় আমি ভালবাসি। "আশ্চর্য্য, তাই নাকি?"
বাজে প্রাণে প্রীতির গীতি। "বাজে-র বেশি নাই নাকি?"
নীরব দাহে এই যে ভস্ম—"সিগারেটের ছাই নাকি?"
মরে' আছি,—স্বর্গে লহ। "এইটি ভূতের ঠাঁই নাকি?"
এ প্রেম হেমের মতন উজল! "মতন? আসল পাই নাকি?"
লও গো হৃদয়! "লওগো বিদায়; তুল্‌ছ একটু হাই নাকি?"
আমায় পেলে—"টাকা পাবে? ঘাসের বিচি খাই নাকি?"
তোমার যাহা—"আমার তাহা? বেজায় ঠকের চাঁই নাকি?"

চীন পরিব্রাজক শংটং

শংটং বুদ্ধ-পীঠের যাত্রী। তিনি মানস-সরোবর পাড়ি দিয়া হিমালয়ের ক্রৌঞ্চ-রন্ধ্রের পথে ভারতে পৌছিবেন, স্থির করিলেন। মেঘদূতে বর্ণিত ক্রৌঞ্চ-রন্ধ্রের উত্তর সীমায় উপস্থিত হইতেই সীমান্তের লোকেরা শংটং-কে বলিল, "ঠাকুর, আপনি এ ভীষণ পথে পা বাড়াইবেন না; একা যুধিষ্ঠির অই পথ ধরিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন,—আর কেহ এ পর্য্যন্ত অই রুদ্রপুরীর দিকে যায় নাই,—যাইতে পারে না।" ঠাকুর বাধা না মানিয়া সশিষ্য ক্রৌঞ্চ-রন্ধ্রে ঢুকিলেন। পথ প্রশস্ত, বাতাস প্রশান্ত ও দৃশ্য মনোরম। তিন দিনের পথ চলিবার পরেই ভূমিকম্প উঠিল; পথের ধারের পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, আর গন্ধকের ধোঁয়ায় পথ দেখা অসম্ভব হইল। শংটং তাঁহার শিষ্যদের আর্তনাদ শুনিলেন,—তাহারা বুঝি একে-একে পাথর চাপা পড়িয়া মরিতেছে; তাঁহার নিজের গায়েও যেন একটা পাথরের আঘাত লাগিল।

তাহার পর কতক্ষণ কাটিল কে জানে; শংটং দেখিলেন তিনি একটি বিস্তীর্ণ নদীর কূলে একখানি নৌকায় বসিয়া আছেন। নৌকার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তিনি মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সে নৌকার তলা নাই কেন; মাঝি কথা কহিল না। তাহার পরেই শংটং দেখিলেন তাঁহার নৌকার তলা দিয়া কয়েকটি মৃত শরীর ভাসিয়া যাইতেছে, আর সেই মৃত শরীরের মধ্যে একটি ঠিক তাঁহার নিজের দেহের অনুরূপ। শংটং-এর বিস্ময় ঘুচাইয়া মাঝি বলিল, যে সেটা শংটং-এরই শরীর। ভাঙা নৌকা নদী পার হইয়া গেল।

নূতন উপনিবেশ

ওরে মজুর ! 'আজ্ঞে হুজুর !' কেনিয়াতে ঠাঁই নাই।
'যাব কোথা ?' সেইত কথা ! প্রাণের যখন খাঁই নাই—
(এই মাহাত্ম্য হিঁদুর মস্ত !) হেন মুল্লুক প্রায় নাই
যেথায় নাহি পারিস্ যেতে—পাথেয়াদির দায় নাই ;
যেতে পারিস্ আণ্ডামানে, হণ্ডুরসে, চায়নায়,
মেরেখাইবো, টিটিকাকা,—ঠিক মিলেছে ! গায়নায়
দেদার পাথর, পাথার-ভূমি—লোকে সে দেশ ছায় নাই ;
খেটে খেলেই পেটে জোটে ; কিসে বল আয় নাই ?
'আচ্ছা রাজি ! তবে সাজি। কিসে মোদের রায় নাই ?
মোদের দেশের নচিকেতা কোথায় বল যায় নাই' ?

হরি ঠাকুরের দুঃখ

বিশ্বে লোকের যুগিয়ে অন্ন, সারাদিনের পরিশ্রমের পরে,
আরাম নিতে গেলেন হরি নিরালাতে বৈকুণ্ঠের ঘরে,
উঠ্‌লো বেজে কাঁসর-ঘণ্টা সঙ্গে-সঙ্গে স্তোত্র হরিনামের ;
হরি বল্‌লেন্—একি বালাই ! খসিয়ে দিলে পোকা দুটো কানের !
সন্ধ্যারতির ভয়ে হরি হাওয়া খেতে যেতেন বহুদূরে,
নিঝুম্ রাতে তাহার পরে চুপি-চুপি ফিরতেন্ নিজপুরে।

তাতেও লোকে সাধ্‌লো বাদ ; দুপুর রাতে বয়ে নিতে মড়া,
বল্‌লে এম্‌নি—'হরি বোল্‌'—বিভীষিকার সুরটি ভেঁজে চড়া,
আঁৎকে উঠ্‌লেন্‌ নিজেই হরি ; অন্য-পরের কথা কিবা বলি !
ধুত্তোরি ছাই—বলে' প্রভু দেশান্তরে গেলেন্‌ শেষে চলি।
হরি-হারা সারা দেশে দুর্ভিক্ষ-মেলেরিয়া বাড়ে ;
তবুও যে বাজে খোল, গণ্ডগোল কেহ নাহি ছাড়ে।
লোকের দুঃখে দয়াময়ের বক্ষ যবে কৃপায় ওঠে কেঁপে,
বলেন্‌ তিনি—না, যাব না ! ফিরে গেলেই যেতে হবে ক্ষেপে।

গোকুল

(গল্প)

বাংলাদেশের লোকরঞ্জন পুরাণে বলে—রামায়ণের কবি ত্রেতা-যুগের বাংলা ভাষায় ঘন-ঘন মরা-মরা আওড়াইয়া অনিচ্ছায় রাম নাম করিয়া মুক্তি পাইয়াছিলেন, আর আমি কাজের দায়ে ষোল আনা ইচ্ছায় সারাদিন হরিকে ডাকিয়া ছোট-খাট কাজ হাসিল করিতে পারি না। একদিন বেলা তিনটার সময় 'ও হরি, ওরে হ'রে' বলিয়া অনেকক্ষণ চেঁচাইবার পর আমার বৈঠকখানার ফরাসের উপরে হরি হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিল ও অতি কষ্টে বলিল—যাই। আমি বৈঠকখানার পাশের ঘরে ছুটির দিনে আমার মুন্সি মহিমের সাহায্যে নানা নজির ঘাঁটিয়া মক্কেলের মুক্তির উপায় খুঁজিতেছিলাম ; মহিম তখন আমাকে চুপি-চুপি

জানাইল বারান্দার উপরে একজন ফিরিঙ্গি সাহেব দাঁড়াইয়া আছে। আমি সেই লোকটির খবরের জন্য হরিকে ডাকিয়াছিলাম। হরি গায়ের আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া বারান্দায় আসিতেই আমার দর্শন-প্রার্থী হরির হাতে একখানি কার্ড দিল, আর হরি সেখানি আমার হাতে দিয়া জানাইল, কে-একজন সাহেব আসিয়াছে। হরি আমার আদেশে লোকটিকে বৈঠকখানার ঘরে একখানি চেয়ারে বসাইল ও নিজের মর্জিতে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

যেরকম মলিন কার্ডে A. D. Cary লেখা ছিল তাহার চেয়েও মলিন ইউরোপীয় পোষাকে আমার দর্শন-প্রার্থীকে দরজার ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইলাম। মহিম তাহার গভীর অভিজ্ঞতায় দৃষ্টিমাত্রেই বুঝিয়াছিল, লোকটি মক্কেল-শ্রেণীর নয়; তাই সে তাহাকে নিজে ডাকিয়া না আনিয়া চুপি-চুপি তাহার সংবাদ দিয়াছিল, আর আমিও সেই ইঙ্গিতে তাহাকে ব্যবসায়ের ঘরে ডাকি নাই। লোকটির মুখ দেখিয়া মনে হইল তাহাকে যেন চিনি; কেন এমন মনে হইল, তাহা বিশেষ না ভাবিয়াই বৈঠকখানার ফরাসে গিয়া বসিলাম। আমার ডা'ন্ হাতের কনুইটি তাকিয়ায় দাবাইয়া ইংরেজি ভাষায় বলিলাম—Yes, what can I do for you, sir? কার্ডের কেরি সাহেবের ঠোঁট কাঁপিতেছিল; সে মুখ নীচু করিয়া প্রায় কাঁদ-কাঁদ স্বরে বাংলা ভাষায় বলিল—আমি গোকুল। 'ও, তাইত' বলিয়া আমি ফরাস ছাড়িয়া একখানি চেয়ার টানিয়া গোবর্দ্ধন অধিকারীর হারান' ছেলের পাশে গিয়া বসিলাম।

গোকুল বলিল—আমি যে কি হইয়াছি, তাহার একটু আভাষ দেওয়ার জন্য আপনার হাতে আমার ইংরেজি রকমের নামটি দিয়াছি, কিন্তু আসিয়াছি আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে।

বুঝিলাম—গোকুল বিশেষ বিপদে পড়িয়াছে। ঠিক মনে আছে, ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে গোবর্দ্ধন অধিকারী আমাকে কলিকাতায় আসিয়া জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার ছেলেটি লেখা-পড়া ছাড়িয়া কোথায় নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। গোবর্দ্ধনের বংশ বর্দ্ধন করিয়াছিল তাঁহার একই পুত্র গোকুল; সে কি অবস্থায় তাহার আচার ও আহার বদ্‌লাইবার ফলে 'গো-কুল' ধ্বংস করিয়া নামের উপাধির 'অধিকারী' শব্দটাকে বাঁকাইয়া—এককে তিন করিয়া এ. ডি. কেরি করিল, তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। কিন্তু মনে হইতেছিল, সে বড় দুর্বল,—হয়ত-বা পেট ভরিয়া কিছু খায় নাই; তাই আগে তাহাকে কিছু খাইতে অনুরোধ করিলাম। গোকুল তাহার স্বীকৃতি জানাইল। মহিম নিশ্চয়ই গভীর মনোযোগে আমাদের কথা শুনিতেছিল; কিছু না বলিতেই সে চেঁচাইয়া হরিকে ডাকিল ও পরে নিজের হাতে এক-খানি থালায় কিছু খাবার দিয়া গেল। আমি উৎসাহিত করিলাম, আর গোকুল আগ্রহে আকাঙ্ক্ষা পূরাইয়া খাইল।

গোকুল কলিকাতায় লেখাপড়া করিবার সময় গোবর্দ্ধন তাহাকে অনেক টাকা দিতেন; শিষ্য-যজমানের কৃপায় গোবর্দ্ধনের টাকার অভাব ছিল না। ইংরেজী না শিখিলে আর খড়ম্‌-পায়ে, গাম্‌ছা-কাঁধে থাকিলে একালে মান-সম্ভ্রম বাড়ে না ভাবিয়া গোবর্দ্ধন গোকুলকে লম্বশাট-পটাবৃত না করিয়া লম্বা-শার্ট-কোটাবৃত করিয়াছিলেন; কিন্তু গোকুল একদিন গোবর্দ্ধনের লোহার সিন্দুকের টাকা খালি করিয়া কোথাও উধাও হইয়াছিল। গোকুল সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছিল, তাহাতেই আমি তাহার পূরা ইতিহাস পাইয়াছিলাম।

গোকুলের মামাবাড়ীর গ্রামের জনার্দন ভট্টাচার্য্য কোন অপ্রকাশিত কারণে খৃষ্টান হইয়াছিল, আর মাদ্রাজে গিয়া গা-ঢাকা দিয়া জাত-

ফিরিঙ্গি সাজিয়াছিল, ও সুকৌশলে আপনার জনার্দন নামটিকে John Ardenএ পরিণত করিয়াছিল ; কারণ সেদিনে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অনেক চাক্‌রি ফিরিঙ্গিদের ভাগ্যেই ভাল জুটিত। জনার্দন ওরফে জনার্ডেন কলিকাতায় গোকুলকে পাইয়া বসিয়াছিল।

গোকুল প্রথমে মুগ্ধ হইয়াছিল জনার্দনের মহিমায় আর তাহার পরে মজিয়াছিল ফিরিঙ্গি-খানায় কল্পিত নূতন আকাঙ্ক্ষার আবর্তে। সে ভাসিয়াছিল নানা স্রোতে, হাবুডুবু খাইয়াছিল নানা জলে, কিন্তু একটা পৈতৃক সংস্কারের জোরে গোবর্দ্ধনের লোহার সিন্দুকের টাকা ভাল করিয়া উড়ায় নাই,—কিছু পুঁজি রাখিয়াছিল। কারণ, গোকুলচন্দ্র জানিতেন, তিনি যখন গোবর্দ্ধন ধারণ করিলেন না, তখন গোবর্দ্ধনের আওতায় তাঁহার বাড়িবার আশা বন্ধ হইয়াছিল।

একবার কিছু মাসোয়ারা পাইয়া গোকুল বিনা খরচে এক জাহাজে বিলাত গিয়াছিল ও সে সেদেশের কয়েকটা শহর দেখিয়াছিল। দেশে ফিরিয়া একটা চাক্‌রি পাইবার পর বাসা নিয়াছিল ফিরিঙ্গিদের পাড়ায়। যাহারা জাহাজে চড়িয়াছে ও বিলাত দেখিয়াছে, তাহারা ফিরিঙ্গি মহলে নৈকষ্য কুলীন। গো-কুল-কাটা কেরি সাহেব তাহার বাসার অংশ-বিশেষের অধিষ্ঠাত্রীর মায়াজালে পড়িয়াছিল। মায়াবিনী গন্ধ পাইয়াছিল—কেরির কিছু টাকা আছে আর তাহার পক্ষে কুলীনের সংস্পর্শ ছিল গৌরবের।

এবারে পৈতৃক সংস্কার গোকুলকে বাঁচাইতে পারিল না ; তাহার পুঁজির টাকা উড়িয়া গেল। মাইনের টাকায় আর চলে না, আবার অন্যদিকে মায়াবিনীর রাক্ষসী প্রকৃতি গোকুলের জাগ্রত স্বপ্নে নরকের দৃশ্য সৃষ্টি করিতে লাগিল। সে মানসিক জ্বালায় অধীর হইয়া উঠিল ও দৈবাৎ আমার নাম মনে পড়ায় আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল।

জনার্দন এখন তাহার জন্ আর্ডেন্ নাম ও খৃষ্টানি মুছিয়া ফেলিয়া স্বামী পুষ্করানন্দ হইয়াছিল। সেসময়ে এখনকার মত স্বামীর দল বহু সংখ্যায় দেখা যায় নাই, আর তখন যে সন্ন্যাসী বা স্বামী ইংরেজী বুক্‌নি ঝাড়িতে পারিত, তাহার আদর ও প্রতিপত্তি ছিল বড় বেশি। চাক্‌রি হারাইয়া সে দুঃখিত হয় নাই, কেন-না তাহার উপার্জন হইতেছিল অতি মাত্রায় অধিক। সে তাহার পূর্ব পরিচিত অনেক স্থানে গা-ঢাকা দিয়া জ্যোতিষ-গণনার ছলে নানা কথা বলিয়া খুব চমক লাগাইতে পারিত। দৈবাৎ জনার্দনের সঙ্গে দেখা হওয়ায় গোকুল সংবাদ পাইয়াছিল—বৃন্দাবনধামে গোবর্দ্ধনের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে। এ সংবাদে নূতন আলোক চম্‌কিয়াছিল ও সেই আলোকে গোকুল একদিকে দেখিল প্রাণভরা নিঃস্বার্থ স্নেহময় পিতাকে ও আর একদিকে মায়াবিনী রাক্ষসীকে। জনার্দনের মত তাহার পলাইবার সুবিধা ছিল না ; তাহার মায়াবিনী তখনও জানিত না—গোকুলের পুঁজি উড়িয়া গিয়াছে ; কাজেই সে ঠাঁই-ছাড়া হইতে গেলেই তাহার নামে বিবাহের চুক্তি-ভঙ্গের মকদ্দমা দায়ের হইতে পারে ও তাহার ফলে গায়ে এমন ছাপ পড়িতে পারে যে, কোন স্বামীগিরির গৈরিকে তাহা ঢাকিতে পারে না। সে অধীর হইয়া একটা উপায় খুঁজিবার জন্য আমার কাছে আসিয়াছিল।

আমি ভাবিতেছিলাম কি করা যায়, আর আমার মুখ দেখিয়া মহিম তাহা বুঝিতে পারিয়া কাগজ-কলম নিয়া আমাদের কাছে আসিয়া বসিল। মহিম তাহার প্রয়োজনের সকল নাম ঠিকানা প্রভৃতি টুকিয়া নিয়া বলিল যে, সে না-ফেরা পর্য্যন্ত গোকুল যেন আমার বাড়ীতে থাকে। মহিম আমাকে কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল, ও পরে শুনিলাম সে তাহার বন্ধু পুলিস্ ইন্স্‌পেক্টর আস্‌গর আলিকে সঙ্গে করিয়া আপনার প্রয়োজনের কাজ করিয়াছিল।

প্রায় পাঁচটার সময় অপরাহ্নে আস্‌গর আলিকে দরজায় খাড়া করিয়া সে চুণাগলির একটা বাড়ীতে কেরি সাহেবকে ও তাহার মায়াবিনীকে নাম ধরিয়া ডাকিল ; মায়াবিনী দেখা দিল। মহিম তাহাকে বলিল—তাহার হাতে একটা ভীষণ অপরাধের দরুণ কেরির নামে গ্রেপ্তারির ওয়ারেণ্ট আছে। আর পুলিশ প্রমাণ পাইয়াছে—মায়াবিনী তাহার পাপের সহায় ও কেরিকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে। পুলিসের ভয়ে রাক্ষসীর গায়ে জ্বর আসিল, সে কেরির ঘর দেখাইয়া দিয়া তাহার একটা বাক্স ও বিছানামাত্র সম্বল টানিয়া বাহির করিল ও কেরির সঙ্গে যে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, তাহা শপথ করিয়া বলিতে লাগিল। মহিম গোকুলের বাক্স-বিছানা ছুঁইল না। সে কেবল একটা এজাহার নিয়া মায়াবিনীর নিজের হাতে আগাগোড়া লিখাইয়া নিল যে, সে কেবল প্রতিবেশী বলিয়া কেরিকে চেনে, কিন্তু একদিনের জন্যেও কেরির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে নাই ও কেরির কোন বিবরণ সে জানে না। মায়াবিনী নাম দস্তখৎ করিল ও মহিম সানন্দে আস্‌গর আলির সঙ্গে ছেক্‌ড়া গাড়িতে চড়িয়া অদৃশ্য হইল।

গোকুলের বিভীষিকা কাটিয়া গেল ; সে তাহার বাক্স-বিছানার মায়া কাটাইল,—আর চুণাগলিতে গেল না। মহিম গোকুলকে ধুতি-চাদর পরাইয়া আমাদের গ্রামে অর্থাৎ, গোবর্দ্ধনের গ্রামে নিয়া গেল। সেখানে মহিমের উপদেশে গোকুল কি-কি করিয়াছিল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। অল্পদিনের পরেই প্রচারিত হইল—গোকুল বিরাগী হইয়া নানা তীর্থে বেড়াইয়া দেশে ফিরিয়াছে ; গোকুলের শিষ্য-যজমানেরা তাহাকে বরণ করিয়া নিল। একথাও বলি—মাঝে-মাঝে গোকুলের আচরণের নিন্দুক জুটিত, কিন্তু তাহাতে তাহার সিন্দুক খালি হয় নাই।

নন্দী-সংবাদ

নন্দী কহে, মণ্ডপেতে গন্ধ পেয়ে সিন্নির,
"একি ঘেন্না! মান্‌টা বেশি কর্তা থেকে গিন্নির!
শিবের মাথায় পড়ে কলা, দেবীর ভোগে মাংস;
দুর্গা-পূজায় বেজায় ঘটা,—শিবের সময় sham show?
কেউ মানে না পুঁথির নীতি, মুখেই বলে সাম্য;
এবার মোরা কর্তা-ভৃত্যে না-হয় হ'ব ব্রাহ্ম।"
গণেশ বলেন—সর্বনাশ! কহেন কার্ত্তিক—"নন্দী!
বঙ্গদেশে এসেও শেষে শিখ্‌লে না সে ফন্দি,—
যা-খুসি খাও চপ্‌-কট্‌লেট্‌, রোষ্ট্‌-ক্রোকে-আণ্ডা,
বক্তৃতাতে বল্‌বে—তুমি সাত্ত্বিকতার পাণ্ডা।"
হাসির চোটে কেঁদে নন্দী চক্ষু দু'টি রগ্‌ড়ান্;
হেসে-কেঁদে গেলেন্ কার্ত্তিক; এল পয়লা অগ্রাণ।

যুবায় বুড়ায়

(গল্প)

যখন নিজে হাতে কাপড় পরিবার বিদ্যাটা আমারও আয়ত্ত হয় নাই, গোবর্দ্ধনেরও হয় নাই, তখন গোবর্দ্ধন আমার খেলার সাথী ছিল। তবুও সন্দেহ হয়—গোবর্দ্ধন বয়স ভাঁড়াইয়া শিশু সাজিয়া আমার সঙ্গে খেলা করিত কি-না। কারণ সেভাবে হিসাব না করিলে আমার বয়স বড় বাড়িয়া যায় ; অন্যদিকে আবার গোবর্দ্ধনের পৌত্রটি একজোড়া গোঁফ, দেড়-জোড়া শিশুসন্তান আর দুই জোড়া পরীক্ষার উপাধির অধিকারী হইয়াছে।

গোবর্দ্ধনের পৌত্র প্রফুল্ল আমাকে যেমন ভালবাসে, প্রফুল্লের পিতাও আমাকে তেমনই ভালবাসিয়া থাকে। তবে প্রফুল্লের পিতা পলিত-কেশ ও গলিত-দন্ত নিয়া আমাকে জেঠামশায় বলিলে আমি একটু আঁৎকাই।

একদিন যখন গুড়গুড়ির নল-হাতে বঙ্গসমাজ সংস্কারের উপায় খুঁজিতেছি, প্রফুল্ল তখন তাহার প্রফুল্লতা ছড়াইয়া আমার পাশে আসিয়া বসিল। আমি অন্যমনস্ক-ভাবে তাহাকে হুঁকার নলটি বাড়াইয়া দিয়া তামাক খাইতে বলিলাম ; সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল !

একি অবিচার ! বালকেরা যদি তামাক খায়, তবে আমাদের সাম্‌নে খাইবে না কেন ? তাহারা যদি নির্দোষ আমোদ উপভোগ করিবার সময়েও আমাদের সঙ্গে উঠিতে-বসিতে না পারে, অতি প্রয়োজনের তামাকটুকু ধোঁয়াইবার আড়াল খুঁজিয়া বেড়ায়, তবে

কখনও উহাদিগকে আমরা সঙ্গের সঙ্গী করিতে পারিব না। বৃদ্ধেরা যদি প্রফুল্ল মুখ দেখিতে না পায়, যৌবন-সুলভ উৎসাহের অভিনয়ে আনন্দলাভ করিতে না পারে, নব-জীবনের ফুটন্ত সৌন্দর্য্য দেখিবার অবকাশ না পায়—তবে যে বৃদ্ধত্বের ভার অসহ হইবে!

অতি প্রাচীনযুগে একটি বিষয়ে বৃদ্ধত্বের যে বিশেষ গৌরব ছিল—যাহার জন্য তরুণ বয়স্কেরা বৃদ্ধের সঙ্গ লাভ করিতে চেষ্টা করিত, এযুগে সে বিশেষত্ব চলিয়া গিয়াছে। বুড়া অতীত কালের কথা কহিত, গ্রামের ও নগরের ইতিহাস বলিত, নিজের অভিজ্ঞতায় দেশ-বিদেশের রীতি-নীতির বিবরণ শোনাইত; কাজেই যুবক ও বালকের দল বুড়াকে ঘিরিয়া বসিয়া আনন্দ লাভ করিত। এযুগে প্রত্নতত্ত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আছে, সংবাদ-পত্র আছে; এখন আর কেহ কিছু বুড়ার মুখে শুনিবার অপেক্ষা রাখে না। এবিষয়ে বুড়ার গৌরব শেষ হইয়াছে।

এদেশে শিঙ্‌ ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে-মেশা অগৌরবের কথা; বাছুর ছাড়িয়া দূরে থাকিলেই কি গৌরব বাড়ে? বুড়ারাই যদি জোট্‌ বাঁধিয়া একঘরে হইয়া শুকাইয়া মরিতে চায়, তবে যুবকের দল আমাদিগকে নির্বাসিত করিলে নালিশ্‌ করিবার উপায় দেখি না। যুবকদের দৌড়-ধাপেও আমরা তাহাদের সঙ্গী হইতে পারি না। সকল যুবাই দৌড়ায় না; দু-একজন বসিয়া থাকে। আমরা সেই বসিয়া-থাকিবার দলে থাকিয়া দৌড়ধাপকে উৎসাহিত করিতে পারি। অবিবাহিতেরা যখন প্রেম খুঁজিয়া বেড়ায়, তখনও আমরা তাহাদের সহায় হইতে পারি। কেন-না, যুবক-যুবতীদের চুম্বনের উপর পৃথিবীকে অনেকখানি নির্ভর করিতে হয়; মানব-সমাজ আপন পুষ্টি লাভের জন্য অই চুম্বন-লীলার প্রতীক্ষা করিতেছে। আমাদের শুভ্র আশীর্বাদে

যৌবনের রক্তাধর পুণ্য-গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া উঠুক্—প্রীতির আলিঙ্গনে স্বর্গের করুণা-ধারার বৃষ্টি হোক্।

আমি প্রফুল্লকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। বালকের অভিমান দূর করিবার জন্য মায়ের মুখে যে উৎসাহিত করুণার হাসি ফুটিয়া ওঠে, প্রফুল্ল তেমনই করিয়া হাসিয়া স্নেহার্দ্র মধুর স্বরে কহিল—যে-সমাজে বৃদ্ধেরা আশীর্বাদরূপে প্রতিষ্ঠিত ন'ন্, সে সমাজ কি টিকিতে পারে? প্রফুল্লের টেড়িটি না ভাঙ্গিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলাম—জীবন-বিজ্ঞানের (biology) হিসাবে, সমাজতত্ত্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে একথা সত্য যে, যে-সমাজে শিশুর মৃত্যু অধিক, যে-সমাজে অনেক বুড়া জীবিত থাকে না, সে সমাজের গতি ক্ষয়ের দিকে,—স্বয়ং যম সে সমাজের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু উহাতে প্রমাণিত হয় না—যুবকেরা বৃদ্ধদের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া আমোদ-উৎসব না করিলে সমাজের বেশি ক্ষতি হয়। এ সিদ্ধান্তও জীবন-বিজ্ঞান ও সমাজ-তত্ত্ব-সম্মত যে, জ্ঞানহীন শিশুও শিশুটিকে বাছিয়া নিতে চায়, শিশু দেখিলে তাহার সঙ্গে খেলা করিতে ছোটে; যুবক যুবককে খোঁজে (যুবতীকেও বটে); যে যাহার আপনার অনুরূপ দলে মিশিতে চায়। গুণগ্রাহী মানুষ গুণের মুখ চাহিয়া সামাজিকতা করিলেও প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে না। প্রফুল্ল তাহার জিজ্ঞাসাময় উজ্জ্বল চোখ দুইটি উজ্জ্বলতর করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বলিতে লাগিলাম—

অই দেখ আমার টবের ক্রোটন গাছের পাতার মধ্যে পতঙ্গের যে কীটরূপী অর্ভকটি সুপ্তবৎ পড়িয়াছিল, সে এখন পতঙ্গের দেহ ধরিয়া উড়িতেছে। কখনও অই পতঙ্গ-শিশু জলে বা দর্পণে আপনার মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখে নাই—কখনও আপনার জাতিকে চিনিয়া নেওয়ার

নিদান পড়ে' মরেন বৈদ্য, বিশ্বে জয়ী হাতুড়ে ;
অভিজ্ঞতা খোঁজে লোকে বুড়ায় ছেড়ে আঁতুড়ে।
নয়-ক জোরে—ঠারে-ঠোরে বল্‌ছি আধ-সরমে,
বেড়ে গেল অভিজ্ঞতা দুঃখে ব্যথায় চরমে।

বুড়ার উপদেশ

স্থান—সদানন্দের বৈঠকখানা, সময়—অপরাহ্ণ

সদানন্দ বৈঠকখানায় আসিয়া বসিতেই কয়েকজন যুবক ঘরে ঢুকিয়া ফরাসের এখানে-সেখানে বসিল। সদানন্দ সকলকেই চিনিতেন ; একবার সস্নেহে সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া পাশের বাক্সটি খুলিয়া হিসাবের খাতা বাহির করিলেন ও তাহার একটি পৃষ্ঠায় দু-এক ছত্র লিখিয়া খাতাখানি বন্ধ করিলেন। যুবকেরা দু-এক মিনিট এ-উহার মুখের দিকে তাকাইল, ও পরে একজন যুবক একটুখানি জড়সড় ভাষায় বলিল, আমরা আপনার কাছে কিছু উপদেশ পাইবার জন্য আসিয়াছি। সদানন্দ হাসি চাপিতে পারিলেন না ; তিনি ঠাওর করিয়াছিলেন, ছেলেরা তাহাদের একটা খেয়ালের অনুষ্ঠানে চাঁদা চাহিতে আসিয়াছে আর উপদেশ চাওয়াটা তাহার ভূমিকা। বিদ্যালয়ের লেখাপড়া যখন শেষ হইয়া আসে, সে সময় পর্য্যন্ত উমেদারির দিক্‌দারিতে মুখ মলিন হয় না ; সেই সময়েই যুবকেরা অনেক খেয়ালের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

সদানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তোমাদের ষাঁড়ের গোবরের প্রয়োজন হইল কেন, বুঝিলাম না। বক্তা যুবকটি থতমত খাইয়া

বলিল—আজ্ঞে সে কি কথা! সদানন্দ বলিলেন—ঠিক কথা বলিয়াছি বাছা; জীবনের পথ বহিয়া আসিবার পর যখন নানা জ্ঞান আসিয়া বুড়ার শরীরে বাসা বাঁধে তখন সে জ্ঞান ও সে অভিজ্ঞতা ষাঁড়ের গোবরে দাঁড়ায়। কেন-না একদিকে সে জ্ঞান খাটাইয়া বুড়ার পক্ষে কাজ করার সুযোগ থাকে না; কর্মভার তখন পড়ে যুবাদের হাতে। অন্যদিকে যুবারা মুখে যাহাই বলুক, তাহাদের সমগ্র জীবনের প্রবৃত্তি এই, ঠেকিয়া-ঠেকিয়া ও ঠকিয়া-ঠকিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে চায়; অভিজ্ঞতার মানেও তাই।

যুবকেরা কি-যেন বলিতে উৎসুক হইতেছিল, কিন্তু বুড়া তাহাদের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—তোমরা নিশ্চয় একটা বিশ্বহিতকর অনুষ্ঠানে হাত দিয়াছ; সেটা হয় নারী-জাতির মুক্তিদান, না-হয় চাষাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, না-হয় পীড়িতের সেবা, না-হয় আর কিছু। সেই অনুষ্ঠানের জন্যে তোমাদের কিছু চাঁদা চাই, নয় কি? বক্তা যুবককে ঠোঁট চাটিয়া সে কথা স্বীকার করিতে হইল, তবে সে অনুষ্ঠানটির কথাও শোনাইবার জন্য পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিল। সদানন্দ আবার হাসিয়া বলিলেন, তিনি সে সকল কথা পরে শুনিবেন; কারণ, তিনি জানেন, যুবকেরা তাঁহার টাকা ইচ্ছা করিয়া অসৎ কাজে লাগাইবে না। আগে হইতেই সদানন্দ পাঁচটা টাকা হিসাবের খাতায় খরচ লিখিয়াছিলেন আর বাক্স হইতে সেই টাকা বাহির করিয়া যুবকদের হাতে দিলেন। হাতে দিবার সময় বলিলেন, তিনি চাঁদার খাতায় নিজে হাতে নাম লিখিবেন না। যুবকেরা আর কথা কহিবার সুবিধা না পাইয়া চলিয়া গেল। সদানন্দ একবার উঁকি মারিয়া দেখিলেন, তাহার বড় নাতিটি পাঁচিলের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। সদানন্দ ভাবিলেন—যুবকদের দায়িত্বজ্ঞান বাড়াইবার

জন্যে এইরূপ টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন আছে ; তবে অনুষ্ঠানটি যে অল্প-দিনেই মরিবে, তাহাও জানিতেন।

সদানন্দের মনে তাঁহার তরুণ জীবনের ইতিহাসের ছায়া পড়িতেছিল, এমন সময়ে সেই ছায়ার উপরে গেরুয়া পরিচ্ছদের আলোক ছড়াইয়া কোন একটা মহাত্মাকুলের প্রতিনিধি আসিয়া দাঁড়াইলেন। সদানন্দ সে দৃশ্যে একটুখানি কাহিল হইয়া পড়িলেও বলিলেন—আসুন্, আমার ফরাসে আপনার পায়ের ধূলা দিন্। আগত ব্যক্তি তাহাই করিলেন। তাঁহার সারা পায়ের ধূলায় ফরাসখানি ধূসরিত করিয়া বসিলেন। লোকটির গায়ে ছিল গেরুয়ারূপ ধর্মপ্রাণতার বিজ্ঞাপন-আঁটা আর মুখের ছবিতেও ছিল সেইরূপ গুরুগিরির দম্ভ যাহা ধর্মের সাধনায় প্রায়ই ফুটিয়া উঠিতে ছাড়ে না।

মাণ্ডুক্যসঙ্ঘের জ্ঞানসরোবরের এই হংস বা পরমহংসকে কি উপায়ে বিদায় দেওয়া চলে, সদানন্দের মনে সেই ভাবনা কঠ-কাঠক প্রশ্নের মত কঠিন হইতেছিল ; এমন সময়ে তাঁহার বয়স্য কাশীনাথ আসিয়া জুটিলেন। সদানন্দ একটু বল পাইয়া স্বামীজিকে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সদানন্দ জানিতেন, স্বামীজির প্রার্থনা চাঁদা ; তবে তাহা দিবেন না, স্থির করিলেন। কথার সোজা উত্তর না দেওয়া গুরুগিরির লক্ষণ ; স্বামীজি, সদানন্দকে পরলোক-বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

সদানন্দ বলিলেন—আমি বুজরুকি করি না, বলিতে পারিব না ; আমি নচিকেতাও নই, থিওসফিষ্টও নই যে ওপারের কথার একটা প্রত্যক্ষ সংবাদ দিব। স্বামীজি নিজ মূর্তি ধরিয়া ভ্রূ কোঁচ্কাইয়া বলিলেন—আপনি কি নাস্তিক ? এবারে সদানন্দের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা দেখা দিল ; তিনি জবাবে বলিলেন—যাহা সত্য, যাহা আছে, তাহা না

মানা ও সঙ্গে-সঙ্গে কাল্পনিক কথা-মানা যদি নাস্তিকতা হয়, তবে আপনিও নাস্তিক, আমিও নাস্তিক, সকলেই নাস্তিক; তাহা ছাড়া মহাভারতে পড়িয়াছিলাম—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণে দান চাহিলে নাস্তি বলে সেও নাস্তিক। ধরুন, আপনি যদি আপনার পরমহংস-সঙ্ঘের সেবার জন্যে কিছু চাহিতেন আর আমি না দিতাম, তাহা হইলেও হইতাম নাস্তিক। এই শেষ কথাটিতেই স্বামীজি বা পরমহংস ক্ষীরে-নীরে প্রভেদ করিতে পারিলেন, কাজেই আর ধর্মালোচনার প্রয়োজন দেখিলেন না; তিনি সাধনসুলভ ক্রোধে বাহিরের মুক্ত বাতাসে চলিয়া গেলেন।

কাশীনাথ বলিলেন—দাদা, হংসটি যে উড়িল; কিন্তু পরলোক কি নাই? যে অত্যধিক উত্তাপে পৃথিবীর সকল উপকরণ পুড়িয়া ও গলিয়া পড়িয়াছিল, সে উত্তাপ কমিতেই যদি জড়ের উপকরণে জীবনের সৃষ্টি হইতে পারিয়াছিল, তবে শ্মশানের দাহে সব পুড়িয়া শেষ হইতে পারিবে কি? সদানন্দ স্মিতমুখে কাশীনাথের হাত ধরিয়া বলিলেন—কাশীপ্রাপ্তির কথা আর একদিন হইবে।

সেই সময়ে সদানন্দের প্রতিবেশী আর এক বুড়া অতীত জীবনের আনন্দের উৎসবের কল্পনায় বিভোর হইয়া তাহার দাওয়ায় বসিয়া ভাঙ্গা গলায় গাইতেছিল—মনে রইল সই, মনের বেদনা। সদানন্দ বলিলেন—শুনিতেছ কাশীনাথ! আমাদের বিদায় হইবে, সংসারের সঙ্গে বিরহ ঘটিবে আর সেই শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত মনের কথা মনেই থাকিয়া যাইবে; জীবনের প্রহেলিকা মনের মত করিয়া বোঝা যাইবে না, খুলিয়াও বলা হইবে না।

পূজার আয়োজন

স্তোত্র পড়ে' চেঁচিয়ে কেঁদে, কাহিল করে' ফেল্‌ব তোমায় পূজায়;
আস্‌বে তুমি মন্ত্রে ভেসে, স্রোতের ধারে মাছে যেমন উজায়।
দাস্যভক্তির নৈবিদ্দির উপহারে ধরব পুণ্যবলে,—
অন্ধকারে ঘুমিয়ে মানুষ, যেমন-ধারা ইঁদুর ধরে কলে।
সারিয়ে নেব যত ব্যামো, টাকাকড়ি নেব অনেক দানে ;
তাহার পরে চাইব মুক্তি, যদিও না জানি তাহার মানে।

বুড়ার কাহিনী

নাকের ডগায় চস্‌মা টানিয়া সদানন্দ ছবির বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল আর সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছিল—চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত-সত্ব যোগাৎ—সেই সময়ে শ্রীহরির নামে হাই তুলিয়া বয়স্য কাশীনাথ তাহার পাশে আসিয়া বসিল। কাশীনাথ বলিল "দাদা, এ বয়সে ছেলেখেলা ছাড়, ধর্মে মন দাও।" সদানন্দ তামাকের নলটা কাশীনাথের হাতে দিয়া আর চস্‌মাটা নাকে আঁটিয়া বলিল, "ধর্ম ত এ বয়সে এই শীতকালের প্রাতঃস্নানের সময়কার গঙ্গা-স্তোত্রের মত নিজেই ফুটিয়া ওঠে,—সাধনার প্রয়োজন হয় না। গঙ্গা-স্তোত্র যেমন শীতের কম্বল, ধর্মও হয় এই বয়সে সেইরকম ভয়ের সম্বল।" কাশীনাথ তামাকের ধোঁয়ায় একটু কাশিয়া বলিল, "মানে কি, দাদা?" সদানন্দ তাকিয়ায় ঠেসান্ দিয়া বলিল, "মানে অতি স্পষ্ট, মরণের

দূতটা জন্মের মুহূর্ত থেকে খাবি-খাওয়া পর্য্যন্ত সকলেরই সঙ্গে-সঙ্গে ছায়ার মত ঘোরে; ওৎ পাতিয়াই থাকে, কাহারও বয়স গণে না। শিশুরা তাহাকে চেনে না, আর যুবারা হয় প্রবৃত্তির ধোঁয়ায় তাহাকে চোখে দেখিতে পায় না, নয়-ত কাজ-কর্মের প্রাচীরের আড়াল দিয়া তাহাকে ঢাকে, আর পাওনাদারেরাও কথা কহিতে আসিলে বলে—তাহার মরণের অবসর নাই। আমাদের এখন অবসর যথেষ্ট; রাত্রে একাকী পথিক ভূতের ভাবনা এড়াইবার জন্য যেমন চেঁচাইয়া গান ধরে, আমরাও সেই রকম দূতের মূর্তি ভুলিবার জন্য স্তোত্র পড়ি, আর না-হয় নামাবলী দিয়া গা ঢাকিয়া তাহার চোখের আড়াল হইতে চাই; গায়ে দুর্গন্ধের প্রলেপ দিলেও যে সে ছাড়ে না, সেটা বুঝিয়াও বুঝি না।"

কড়া তামাকটা কাশীনাথের সহিল না; সে নল ফিরাইয়া দিয়া কহিল—"তুমি কি ধর্মটাকে ভাব ফাঁকি আর জুয়াচুরি?" সদানন্দ বলিল—না-হে ভায়া, সেটা ফাঁকি-ও নয় জুয়াচুরিও নয়, বরং খুব সত্য। তবে সেটা যে নিজেই দেখা দেয়, সেই কথাটাই বলিতেছিলাম।

সদানন্দের বক্তৃতায় অল্প একটুখানি বাধা পড়িল; নাৎনি কমলা ছবির বইখানি দখল করিয়া পাশে আসিয়া বসিয়া কহিল, "ঠাকুরদা, আজ দাদাদের চড়িভাতি আর থিএটার।" সদানন্দ তাকাইয়া দেখিল—তাহাদের ছোট শহরের অনেক ছেলে দল বাঁধিয়া হৈ-হৈ করিয়া চলিতেছে, আর তাহার নিজের বাড়ীর ছেলেরা একখানা বড় সতরঞ্চি ঘাড়ে করিয়া রাস্তার ছেলেদের দলে জুটিল। সদানন্দ বলিল—"দেখিলে কাশীনাথ, ছেলেরা বুড়োর দলকে এড়াইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতেছে। তাহাদের উৎসবে অপবিত্রতা নাই, তবুও বুড়ারা বাদ পড়ে। উহারা নিত্য-নূতন কাজ করে,—আর কোন্ কাজটি ভাল কি মন্দ, তাহা অভিজ্ঞ বুড়োদের উপদেশে না

শিখিয়া নিজেদের জ্ঞানের পরীক্ষায় ঠেকিয়া-ঠেকিয়া শেখে। আমরা যদি আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে পথ দেখাইবার ব্যগ্রতায় উহাদের মাথার উপর টিক্-টিক্ করি, তবে যথার্থই উহাদের জ্ঞান লাভ হয় না। গোড়া হইতে উপদেশের বোঝা ঘাড়ে করিয়া যদি শিশুরা ও যুবারা চলিত, তবে তাহারা নিষ্কর্মা হইত ও বোকা বনিত,—তাজা জীবন ফুটিয়া উঠিত না। কাজেই এই সঙ্গীহীন আমরা বুড়া-বয়সের দৌলতে একঘরে হই। একা পড়িয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে তাঁহাকেই সঙ্গী করিতে ডাকি—যিনি মরণের দূতের মালিক। তাই ঈশ্বর সকলের কাছে সমানভাবে থাকিলেও বুড়ারা তাঁহাকে বেশি করিয়া আঁকড়াইয়া ধরে। ধর্ম হয় বুড়া বয়সের পাকা চুল ও ভাঙ্গা দাঁতের মত স্বাভাবিক ; অনেক বুড়াকেই কৈফিয়ৎ দিতে হয়—তাহার চুল পাকিল না কেন, তাহার দাঁত পড়িল না কেন ; কৈফিয়ৎ দিতে হয় সে জপের মালা ধরিল না কেন,—ধর্মে মন দিল না কেন। যে-বয়সে যাহা ঘটে তাহা লোকে দেখিতে চায় ; তাই তুমিও আমাকে ধর্মে মন দিতে বলিতেছ।”

কাশীনাথ গা ঝাড়া দিয়া বসিয়া বলিল—“আমরা কি তবে দায়ে ঠেকিয়া ফাঁকিকে ভজনা করি, না ঈশ্বর যথার্থই আছেন ?” সদানন্দ তাহার নাৎনীর বেণী ধরিয়া বলিল, “এই আমার নাৎনী আছে, অই আকাশ আছে, বন আছে, পাহাড় আছে, আরও কত কিছু আছে ; শুধু আছে বলিয়াই সেগুলিকে তুমি ভজনা করিতে যাও না। ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার যদি একটা সম্পর্ক না থাকে অর্থাৎ জীবন্ত সম্পর্ক না থাকে,—তিনি যদি আকাশের মত আমার চোখে স্নিগ্ধ না হন, আমার নাৎনীর মত প্রাণের মধু না হন, তবে আমি চাকরটার জ্বালায় উদাসীন চোখে কতবার আকাশের দিকে তাকাইব—অথবা পাওনাদারের

আক্রমণ এড়াইবার ছলে কতক্ষণ নাৎনীর সঙ্গে খেলা করিব ? তুমি যদি মরণের ভয়ে ঈশ্বরকে খোঁজ তবে হইবে বৃথা ধর্ম ; তুমি শুধু অনিশ্চিতকে কৌশলে মনে রাখিবার প্রয়াসে করিবে মালাজপ, আর আতঙ্ক এড়াইবার জন্য পেঁচার মত মুখ করিয়া হাই তুলিয়া হরি-হরি বলিবে।"

কাশীনাথ বলিল, "গীতায় আছে—।" কাশীনাথের কথায় বাধা দিয়া সদানন্দ বলিল—"রাখ তোমার গীতা, রাখ তোমার শাস্ত্র ও শোনা-কথা ; যাহা তুমি অ-সাধনায় পাও নাই, তাহা কেহ তোমাকে দিতে পারিবে না।"

এই শেষ কথাটা কাশীনাথের ভাল লাগিল। তবুও সে অন্য কথা পাড়িয়া বলিল—"ভাল ঘুম হয় না, কি করি বলত ?" সদানন্দ নাৎনীর বিনুনি ধরিয়া টানিতে-টানিতে বলিল, "প্রাণ ভরিয়া হাস, হো-হো করিয়া হাস।" কমলা বিনুনির টানের জ্বালায় হাসি-ভরা চোখে বলিল—"উঃ বড় লাগে।" কাশীনাথ বাড়ী গেল।

বাড়ীতে ঢুকিয়াই কাশীনাথ দেখিল, তাহার নাতি—ঠাকুরদাদার জুতা পায়ে দিয়া ও লাঠি-গাছটি হাতে করিয়া বুড়ার চলনের অভিনয় করিতেছে। কাশীনাথ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, আর সেই হাসিতে উৎসাহিত হইয়া নাতিটি আরও অভিনয় করিতে লাগিল। কাশীনাথ আনন্দে শুইয়া পড়িল, আর তাহার ঘুম হইল চমৎকার। ঘুম হইতে উঠিয়াই দেখিল, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা আনন্দে কোলাহল করিয়া পুতুল খেলা করিতেছে। কাশীনাথ তাড়াতাড়ি তাহার নামাবলী খানা ছিঁড়িয়া পুতুলদের নূতন-নূতন কাপড় দিল, আর অনেকক্ষণ ধরিয়া ছেলেদের সঙ্গে ছেলে-খেলা করিয়া সুখী হইল।

মহিম্ন স্তোত্র

(বক্তা মন্যু)

ওহে মহাকাল, ওহে ভৈরব, ওহে চণ্ড !
নর হিংসায় উদ্যত তব দণ্ড।
তুমি কুৎসিত, তুমি বীভৎস অতি দৃশ্যে ;
প্রচণ্ড ঘোর চণ্ডাল তুমি বিশ্বে।
কূর্মের মত, শূকরের মত, কদাকারে অবতীর্ণ।
সর্পের মত বিষম ভীষণ, স্পর্শে অশুচি ঘৃণ্য।
নখরে হিংস্র তুমি নৃসিংহ, রক্তে রাঙ্গিছ স্বস্তি,
পিশাচ সাজিয়া শ্মশান প্রস্থে, চিবাও পিশিত অস্থি।
প্রলয়ের কাল জাপান রাজ্যে, রুরের বক্ষে ফরাসী,
ইটালীর মত চলিছ ছুটিয়া গ্রীসের বিভব গরাসি।
অধৃষ্য তুমি দুর্গম, তুমি গুহ্য,
কুৎসিত তুমি চণ্ডাল, তবু পূজ্য।

(মনীষীর উক্তি)

যন্ত্রণা তুমি সান্ত্বনা তুমি অদ্ভুত !
দুঃখ সাগরে জাগরে দীপ্ত বুদ্বুদ।
নিঃশ্বাসে বহ, বিশ্বাসে রহ, উৎসাহে পড় মন্ত্র,
কর্দমে ক্লেদে মর্দিত তুমি, মৃত্যু-যোজিত যন্ত্র।

সন্ধ্যায় তুমি বিন্ধ্যারণ্য নিবিড় মৃত্যু শঙ্কা।
ঊষার রজত হাস্যে ব্যক্ত তুমি কাঞ্চনজঙ্ঘা।
শঙ্কর তুমি সংহার তুমি সূর্য্য !
অদ্ভুত তুমি প্রার্থিত তুমি পূজ্য।

(কবির উক্তি)

চন্দ্রিকা-স্নাত সুন্দর তুমি স্নিগ্ধ ;
সুস্মিত তুমি, পুষ্পিত তুমি, হৃদ্য।
কম্পিত মুখ-চুম্বন তুমি সঞ্চর সারা অঙ্গে ;
শ্বাসের সুবাসে শিহরে বিকাশ, ললিত গতি-বিভঙ্গে।
জীবনে তরুণ, ব্যথায় করুণ, প্রেমেতে অরুণ বর্ণ,
ধীর উল্লাসে চির প্রফুল্ল শারদ সরোজ পর্ণ।
স্পন্দিত প্রেম সঙ্গীতে সুখ ছন্দ ;
অন্তরে তুমি সন্তর নবানন্দ !

কৃষ্ণ-কথা

"দিন যায় মিছে, কাজে ; রাত্রি যায় নিদ্রে !
না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণের চরণারবিন্দে।"

সনাতন হিন্দু ধর্মের খাঁটি দুধটুকু মরিয়া হইয়াছে বৈষ্ণব ধর্মের ক্ষীরটুকু; আর—একটা ছোট ভজনের অই ছোট চরণ দুটি, যুগল চরণের কৃপায় হইয়াছে সেই ক্ষীরে গড়া দুইটি পুলি,—অথবা নিশ্চল শান্তিধামের তীরের—ক্ষীরোদ সাগরের দুইটি ঢেউ। যাহা ভজনের ভোজনে হইয়াছে পুলি বা মালপুয়া, তাহাকে ঢেউ বলিলাম এই জন্যে যে, উহার ধাক্কা সামলাইতে পারে, এমন কোন বিষয়-বাসনা-মত্ত অসুর বা নাস্তিক দেখি নাই।

পাপ বিষয় বাসনায় বুঝিতে পারি না যে, কাজে দিন কাটিলেই "দিন যায় মিছে"। কাজ, মহা পাপ। এই দেখ, ভোরে উঠিয়া, প্রথমেই একটা অতি বড় অশুচি কাজ করিবার পর প্রচেষ্টা হয় পোড়া মুখখানা ধুইবার, যাহাতে একদিন আগুন ধরাইয়া দিবেই দিবে। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপের সময় যাহারা ধ্যানস্থ না থাকিয়া "ছুটা ছুটি করে ভূমণ্ডল," তাহাদের ত্রিতাপের দুঃখের কথা কত বলিব! এখনও সাধু বৈষ্ণবের সেবা-সৎকারের দু'চারিটি মঠ আছে বলিয়াই, আমাদের সনাতন শান্তি রক্ষা পাইতেছে।

লোকেরা তাহাদের নাস্তিক্য বুদ্ধিতে রাত্রিকে করিয়াছে ঘুমের সময়! প্রভুর সৃষ্টি-কৌশল বুঝিলেই এ ভ্রম থাকিবে না। দেখ, রাত্রি

দশটার পরেই পৃথিবী কেমন নিস্তব্ধ হয়; নিঃশব্দে হরিস্মরণের এমন প্রশস্ত সময় নাই বলিয়াই ভক্তেরা আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতে উহাকে গোপীদের অভিসারের সময় বলিয়াছেন।

আমার সুখের দিন আসিয়াছে; রাত্রিকালের ঘুমের পাপ কাটিয়াছে। আমার ঘরের লোকেরা তাহাদের বিষয়বুদ্ধিতে আমার এই মধুর দশাকে রোগ ঠাওরাইয়া ডাক্তার ডাকিয়াছিল। আমার অবস্থার কথা শুনিয়া নাস্তিক ডাক্তারেরও সুবুদ্ধি হইল; তিনি স্বীকার করিয়াছেন, এটা আমার কৃষ্ণপ্রাপ্তির শুভ লক্ষণ।

ঘুমের পাপ যাই ঘুচিয়াছে, অমনি আমার বৈষ্ণবী তনু পুণ্যময় হইয়াছে,—কোন রকমের বিষয় বাসনায় বা কাজে তাহাকে লাগান অসম্ভব হইয়াছে; কেন না, ঘুমের মোহ কাটিবার পর সারাদিন আমার উত্তমাঙ্গ বা মাথার মধ্যে নাম কীর্ত্তনের খোল কর্ত্তালের ধ্বনি ঝাঁ ঝাঁ করে, আর স্বয়ং কৃষ্ণের বাঁশী কানের মাঝে সোঁ সোঁ করে। ইহাকেই বলে,—অনাহত শব্‌দ বাজন্ত ভেরী রে।

একদিন আকুল হইয়া গাইয়াছিলাম, 'সে দিন আমার কবে হবে গো, যে দিন হাসিব, কাঁদিব, নাচিব, গাইব, খ্যাপা পাগল মতন।' "মতন" টুকুও নাকি কাটিবার মতন হইয়াছে,—ডাক্তারেরা বলেন। আমার এই সুখের দিনে অন্য সকলকে বলি,—এখনও হিতবচন শোন, যতনে করি ধারণা,—বিষয় বাসনা ছাড়, কাজ ছাড়, আর রাত্রের নিদ্রা ছাড়।

জীবতন্ত্র

নিগূঢ় তত্ত্ব

কৈলাস শিখরে বসি ভাষিলেন সতী—
জীব তন্ত্র গুপ্ত মন্ত্র কহ পশুপতি।
কেন নানা বাজে জীব সমূলে না মরে,
যাদের উৎপাতে নর দুঃখে ঘর করে—
আর্শোলা, ইঁদুর, উই, উকুনাদি কত,
কৃমি, কেঁচো, কেঁন্নে আর কাঁকড়াবিছে যত,
ছারপোকা, জোঁক্, ডাঁশ, পিঁপ্‌ড়ে ও পিষু,
বোল্‌তা আর ভীম্‌রুল্ মশা, মাছি, বিছু;
বাঘ, ভালুকের পাল, সর্প বিষধর,
আর ধর জলে চলে কুমীর, হাঙ্গর।
কহিলেন সদাশিব সংক্ষেপে উত্তরি'—
না থাকিলে, উঠে যেত বচন 'ধুত্তোরি'।
অতি গুহ্য অতিপূজ্য এ তন্ত্রের বাণী,
ভাগ্যে তুমি নিরালায় শুনিলে ভবানী।
তন্ত্রের 'ফুড়ুৎ' মন্ত্র জপিলে মানুষ,
মুক্তি পাবে ঊর্দ্ধে যাবে চড়িয়া ফানুস্।

পা-পূজা

ভক্ত আধ্যাত্মিক গান গাইলেন—তব অভয় চরণতলে সদা রাখিও। এখানে 'চরণ' শব্দটি রূপকে বসিয়াছে বুঝিলাম; কি ভাব বুঝাইবার জন্য চরণ শব্দটি রূপকে বসিল, ধরা কঠিন। মানুষ, অনুরাগে একজনকে চোখ দিয়া দেখে, তাহার কথা কান পাতিয়া শোনে, আদর করিয়া হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া নেয় ইত্যাদি, ইত্যাদি। পা দিয়া কিন্তু মানুষ কেবল চলে, কাহাকেও আশ্রয় দিতে গিয়া তাহাকে পায়ের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে না বা আঁকড়াইয়া রাখে না। তবে কি হিসাবে রূপকে এই 'চরণ' আসিল? তাহার পরে আবার আছে 'চরণতলে'; চরণের তলে পড়িলে ত চট্‌কানি খাইয়া মরিতে হয়,—অভয়স্থান মেলে না। তবুও অস্বাভাবিক কল্পনায় চরণ-খাড়া করিয়া পূজা করিবার ঝোঁক কেন?

এই পা-পূজার বহর আরও খানিকটা দেখিয়া নিয়া ইহার উৎপত্তির ইতিহাস দিব। পায়ের রূপ বর্ণনা করিয়া উহাকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়, আর ভ্রমরেরা যেমন পদ্মে মধু খায়, সেইরূপ পাদপদ্মের মধুপানের কথাও পাই; একটি আধ্যাত্মিক গানে আছে—'তব চরণামৃত পান পিপাসিত।' সত্য-সত্য এরূপ অভিজ্ঞতা ত মানুষের নাই যে, কাহারও পা চাটিয়া এমন রস পায় যাহাতে তাহার তৃপ্তি হয়। যে পশু-পক্ষী রাঁধিয়া খাই, তাহাদের রাঁধা ঠেং চাটিয়া ও কাম্‌ড়াইয়া তৃপ্তি আছে বটে, তবে সেই রসের অনুভবে কোন ভক্ত রূপকে 'চরণ' শব্দ ব্যবহার করেন নাই, বলিতে পারি।

পায়ের গড়ন ভাল হইলে তাহার সুন্দর ছবিকে পদ্মের সঙ্গে হয়ত একটু অস্বাভাবিক রকমে তুলনা করিতে পারি ; তবে যদি দেবতার আস্ত সাকার পা না থাকে, সে রূপক ত চলে না। যৌন আকর্ষণে পায়ের দিকে ঝোঁক পড়িবার যে বিবরণ পাই, তাহার সহিত কিন্তু পূজা ও ভক্তির সম্পর্ক নাই। যৌন আকর্ষণের কবিতায় পাই—'দেহি পদ-পল্লবমুদারম্', আর হাট-বাজারের হাল্কাগানে পাই—'বৌ, তোর আলতামাখা পা দুখানি'। আমি এই ধরণের পায়ের কল্পনার কথা বলিতেছি না ; উহার ভোগময় বর্ণনা আছে বৈষ্ণবদের 'উজ্জ্বল নীলমণিতে', আর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আছে Haveloc Ellis-এর মত পণ্ডিতের বইয়ে।

মানুষকে যেভাবে আদর করা যায় বা সম্মান করা যায়, সেই ধরণে ঠাকুর-দেবতাদের পূজা হইতে পারে, বুঝিতে পারি। ঘরে মাননীয় অতিথি আসিলে তাঁহাকে পাদ্য দিতে হয়, অর্ঘ্য দিতে হয় ও আহার দিতে হয়। পাদ্য হইল—পা ধুইবার জল, আর অর্ঘ্য হইল উত্তমাঙ্গে বা মাথার দিকে মালা দেওয়া, চন্দনের ফোঁটা দেওয়া, ইত্যাদি। বাংলার অনেক কবির পা-পূজার ঝোঁকের রচনায় 'চরণে অর্ঘ্য' দেওয়ার কথা পড়িয়া হাসিতে হয়। পাদ্য দেয় পায়ে, কিন্তু অর্ঘ্য কেমন করিয়া পায়ে দেওয়া চলে? ঠাকুরের পায়ে পাগ্‌ড়ি বাঁধিয়া দেওয়া বা দেবীর পায়ে খোঁপা বাঁধিয়া দেওয়ার মত পায়ে অর্ঘ্য দেওয়ার যে কোন অর্থ হয় না, তাহা আমাদের কবিদের মনে পড়ে না।

ঠাকুর-দেবতাদের পূজার ধ্যানে কোথাও পায়ের বর্ণনা নাই ; ধ্যান করিতে হয় উর্দ্ধদিকের অঙ্গের ; দেব বা দেবী ত্রিনেত্র, বা বরফের মত শাদা, অথবা অন্যরূপবিশিষ্ট, এইরূপ বর্ণনাই ধ্যানের মন্ত্রে পাই। কিন্তু কোথাও পাই না, তাঁহাদের পা পদ্মের মত বা সারা চরণখানি

কলাগাছের মত। তবুও পা-পূজার কথা ওঠে কেন? বৈষ্ণবদের মধ্যে পা-পূজার ঘটা খুব অধিক; সেই কথা বলিবার পর পা-পূজার উৎপত্তির ইতিহাস দিব।

তান্ত্রিক পূজার মন্ত্রে দেব-দেবী প্রণামের মন্ত্র আছে; প্রণাম কার্য্যটা হয় মাথা নোয়াইয়া, আর একেবারে পায়ের তলায় ঝুঁকিয়া—ইহা স্বীকার করি; তবে সে মন্ত্রে পা বা চরণের বর্ণনা নাই। প্রণামের নামে পায়ের কথার ঘন-ঘন উল্লেখ আছে বৈষ্ণবদের বইয়ে; যেমন—তব চরণে প্রণতা বয়ম্।

ভক্তি দেখাইবার জন্য যে স্বাভাবিক মাথা নত করা বা প্রণাম করার পদ্ধতি আছে, তাহার সঙ্গে পা-পূজার সম্পর্ক আছে বটে, তবে সেকথা আর একটু পরে বলিতেছি। মানুষ-গুরুর চরণ-পূজার কথাও সেই সময়ে বলিব। এখানে বলিতেছি—বৈষ্ণবদের পা-পূজার বাড়াবাড়ির কথা। যিনি যত বড় সাধু, তিনি তত বেশি পরিমাণে তাঁহাদের নামের গোড়ায় 'প্রভুপাদ' প্রভৃতি শব্দ জোড়েন। অই শব্দের অর্থ এমন নয় যে, প্রভু নিজে অচল বা খোঁড়া, আর ভক্ত তাঁহাকে ঘাড়ে করিয়া বহিতেছেন; উহার অর্থ এই যে, ভক্ত বড় হীন,—তিনি ভক্তিতে প্রভুর সেই অঙ্গে একেবারে লাগিয়া আছেন, যে অঙ্গে ধূলা-কাদা প্রভৃতি ঘৃণ্য পদার্থ লাগিয়া থাকে। সাধুটি অই উক্তিতে বুঝাইতে চায়—সে প্রভুর অঙ্গের ভাল দিক্‌টি ছুঁইবার অধিকারী নয়,—সে একটু-খানি অধিকারী, শরীরের অধম অংশ স্পর্শ করিতে। শরীরের অতি অধম ভাগ বা নীচের দিক্ হইল চরণ বা পা; কাজেই সেই অধম অংশের প্রতি অনুরাগ দেখাইলে ভক্তি ও বিনয় বেশি করিয়া দেখানো হয়।

শরীরের নানারকমের পরিবর্ত্তনে মানুষের মনের ভাব খানিকটা ধরা যায়; যেমন—দুঃখ হইলে চোখ বুজিয়া আসে, চোখ দিয়া জল

পড়ে, শরীর কোঁচ্‌কায়, ইত্যাদি। আর কিছু দেখিয়া বিস্ময় হইলে শরীর যেন ফুলিয়া ওঠে, চোখের চাহনি হয় উপরের দিকে, আর মুখে কথা ফোটে না। সেইরূপ—কাহারও প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার বা সম্মান দেখাইবার ভাব জাগিলে মাথা একটু নত হয়, আর চোখ একটুখানি বুজিয়া আসে; তবে পায়ের তলায় গড়াইবার বা পা বেড়িয়া ধরিবার স্বাভাবিক ঝোঁক জন্মে না। কাহাকেও আদর করিতে গেলে বুকে টানিয়া ধরিবার ঝোঁক হয়, আর আদরের পাত্র শিশু হইলে ঘাড়ে করিয়া বা হাতে তুলিয়া দোলাইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এরূপ কোন অবস্থাতেই পা চাটিবার প্রবৃত্তি জন্মে না। মানুষের মনে যদি দুঃখের জ্বালা বাড়ে, তবে স্নায়ুর বিকারে সে ধীরভাবে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকিতে পারে না,—অধীরতার ছট্‌ফটানিতে সে মাটিতে গড়াইতে পারে। এমন হইতে পারে—যাহাদের সংযম অল্প, তাহারা দেবতার কৃপায় দুঃখ তাড়াইবার নিবেদনের সময়ে ধূলায় গড়াইতে পারে বা অচেতন হইতে পারে। দুঃখ দেখাইবার অইরূপ অভিনয় না করিলে যে, দেবতা দুঃখের অবস্থা জানিতে পারেন না অথবা দুঃখের প্রতীকার করেন না—এরূপ ধারণা না থাকিলেও যাহারা অধীর ও চপল, তাহারা মনের বেগে ধূলায় গড়াইতে পারে; উহাতেও কিন্তু এ-অর্থ হয় না যে, দেবতার চরণতলে পড়িয়া অভয় স্থান পাওয়া যায়।

এখানে এ-কথার উল্লেখের প্রয়োজন যে, রাজাদের কাছে কোন-কোন অবস্থার বশ্যতা স্বীকার করিবার সময়ে রাজার সম্মুখে ভূঁয়ে লুটাইতে হয়; তাহার কারণ বলিতেছি। রাজা যদি কোনও সশস্ত্র শত্রুকে বন্দী করেন, তবে সেই শত্রু প্রাণ বাঁচাইবার খাতিরে নানা নিদর্শনে বশ্যতা জানাইতে পারে; হাতের অস্ত্র দূরে ফেলিয়া দিয়া স্পষ্ট বুঝাইতে পারে—সে রাজার গায়ে অস্ত্রাঘাত করিবে না, অথবা

উপুড় হইয়া ভূঁয়ে পড়িয়া বুঝাইতে পারে যে, রাজা যদি তাহাকে মারেন বা কাটেন, তবু সে বিরোধী হইবে না। যদি ঠাকুর-দেবতার পূজার সময়ে অইভাবে বশ্যতা জানাইতে হয়, আর ক্রুদ্ধ রুদ্র দেবতাকে তোয়াজ্ করিয়া বলিতে হয়—'রাখ আর মার, যা' ইচ্ছা এখন'—তবে কোন কথা নাই। মনে এরূপ ভাব থাকিলে চরণতলে বা চরণের সাম্‌নে অভয়-স্থান পাইবার প্রার্থনা অস্বাভাবিক হয় না। কিন্তু যাঁহাদের মনের ভাব আধ্যাত্মিক বলিয়া শুনিতে পাই, আর যাঁহারা পূজ্য দেবতাকে নিষ্ঠুর শয়তান ভাবেন না, অথবা স্তুতিতে বশ করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন না—তাঁহাদের পূজার মন্ত্রে বা গানে চরণ, চরণ-পঙ্কজ, চরণামৃত প্রভৃতি কেন?

বর্বর-যুগে যে-কারণে গুণীজনের বা গুরুজনের পা ছুঁইবার প্রথা জন্মিয়াছিল, অতি অল্পে তাহার একটু ইতিহাস দিতেছি। মানুষ ভিন্ন-ভিন্ন মনের অবস্থায় পরস্পরের প্রতি যে ব্যবহার করে, সেই ব্যবহারের কোন্‌টাকে যে বলিতে হয় সাধু ব্যবহার, আর কোন্‌টাকে যে বলিতে হয় অসাধু বা পাপের ব্যবহার—বর্বরেরা সেকথা আদিকালে স্পষ্ট বুঝিতে পারিত না। তাহারা যখন দেখিত—একজন সাধু, আর অন্য জন পাপিষ্ঠ, তখন ভাবিত—সাধুতা বা পাপ অন্য জড় পদার্থের মতই এক-একটা আলাদা বস্তু, আর সেই সকল বস্তু ভিন্ন-ভিন্ন পরিমাণে মানুষের শরীর ব্যাপিয়া বাস করে। তাহারা বিশ্বাস করিত—একজন যে কাপড় পরে, সেই কাপড়ের গায়ে মানুষের মনের টুক্‌রা বা তাহার সাধুতা-অসাধুতার টুকরা লাগিয়া থাকে। এই বুদ্ধিতে কাহাকেও মারণ, উচাটন ও বশীকরণ করিতে হইলে তাহারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটির কাপড়ের টুক্‌রা কাটিয়া নিয়া বা চুলের গোছা কাটিয়া নিয়া তুক্-তাক্ করিত। আবার যদি কোন গুণীজনের কাছে বসিতে পারা যায়,

তবে তাহার নিঃশ্বাসে ও গায়ের গন্ধে তাহার গুণলাভ করা সম্ভব—এ-কথাও তাহারা মনে করিত। গুরুর উত্তমাঙ্গ বা উপরের দিকের শরীর ছুঁইবার স্পর্দ্ধা করা গুরু-পরিবারের বাহিরের লোকের পক্ষে সম্ভব হইত না ; তবে কোন বিশিষ্ট সেবাদাসী সে অধিকার পাইতেন হয়ত। গুরুর যে পা, ঘৃণ্য ধূলা-কাদা মাড়াইয়া চলে, তাহা ছুঁইতে পারিলে তাঁহার গুণলাভ করা শিষ্যের পক্ষে সম্ভব, ভাবিত। এইজন্যই পা ছুঁইয়া প্রণাম করার প্রথা বর্বর-যুগে প্রচলিত হইয়াছিল, আর সেই প্রথাই ভক্তি ও সম্মান দেখাইবার পক্ষে সনাতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভক্তি দেখাইবার জন্য বর্বর-যুগের পা-পূজার প্রথা সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছে বলিয়াই নিরাকার ঠাকুর-পূজা করিবার সময়েও ভাবের রূপকে চরণ, পাদপদ্ম প্রভৃতি উল্লিখিত হয়।

মর্মান্তিক

আশ মেটে না, পেট ভরে না, সবাই ভবে ক্ষুণ্ণ ;
ভিখারীদের কাঁধের ঝুলি কেউ করে না পূর্ণ।
পাষাণ কেটে তোমায় গড়ি,—তোমায় করি শক্ত ;
মাথা কুটে কঠোর পায়ে ঢালি তাজা রক্ত।
জানি না কি খুঁজে মরি, গড়ি কাশী-মক্কা ;
বরাভয়ের খোলা মুঠায় মেলে খালি ফক্কা।

উপোস করে' কোকিয়ে কেঁদে পুঁজি করি পুণ্য ;
খতিয়ে দেখি খাতার পাতায় আঁকা শুধু শূন্য।
তর্ক-জালের সূতায় সূতায় তবু আঁটি যুক্তি,
ভোগের ভাগ্যে যাহাই থাকুক্—ক্ষোভে আছে মুক্তি।
হয়ত তুমি বল্‌ছ—তোমায় মিছাই দোষে মান্‌ষে,
মিষ্ট খেয়ে পেটটা ভরে' শেষটা বলে পান্‌সে।
কেউবা ঢেলে দিলে পাতে, তোলে হাতে,—খায়না ;
পরে আবার খাবার তরে ধরে বিকট বায়না।
সুখে থেকে ভূতকে ডেকে কেউবা কিল খাচ্ছে ;
কেউবা ফেলে নিজের গণ্ডা ভেরেণ্ডাটাই ভাজ্‌ছে।
মুক্তি খুঁজে মরে পূজে, পচা পুঁথির বাক্যি ;
কথার বড়াই, দলের লড়াই আছে তাহার সাক্ষী।
চাও কি তবে লোকে সবে ছেড়ে দিবে ধর্ম ?
তুমি না-হয় রুষ্ট রহ, তুষ্ট থাকুক মর্ম।

ভূতের বোঝা

ঘাড়ে চাপিলে মানুষ হয় পাগল, তার ভূত না ছাড়িলে সে মানুষ কাজে লাগে না ; দেবতার বেলায়ও সেই কথাই পুরাণে পাই। সতীর মড়া দেহে জীয়ন্তের প্রাণ ছিল না, কেবল ছিল সেই মাংসপিণ্ডের সঙ্গে জড়াইয়া একটা অতীতের স্মৃতি। স্মৃতিকে পচা জড়ে বাঁধিতে গেলে বাঁধা পড়ে না, আর যাহা পচা তাহাও পচিয়া শেষ হয় ; এই পচার সঙ্গে জোড়া যে অতীত বা ভূত, সেটা ভূতের বোঝা ; বিষ্ণুর চেষ্টায় যখন ঠাকুরের ঘাড়ের ভূতের বোঝা নামিয়া গেল, তখন তিনি প্রাণের ধ্যানে প্রাণ পাইলেন।

মুসলমানের আমল থেকে যাহাদের জাতির পরিচয়ের নাম হইয়াছে হিন্দু, তাহাদের সমাজের প্রথায় মড়াকে পোড়াইয়া ছাই করিতে হয়, আর সে ছাইটুকুও ধুইয়া মুছিয়া শেষ করিতে হয় ; প্রীতির স্মৃতির নামে শ্মশানের ছাই পুষিবার প্রথা নাই। এক বংশের আগ্রহে-পোষা ছাই-এর ভাঁড় বা কবরের পাথর, অপর বংশের লোকেদের মনে প্রীতি জাগায় না, জাগাইতে পারে না। যতলোক মরে, তাহাদের সকলের মড়ার সৎকারে যদি ছাই-এর ভাঁড়, কবর বা পুতুলের স্থান করিতে করিতে হয়, তবে সারা পৃথিবী হয় ভূতের বাসা ; জীয়ন্তের দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। আগ্রায় বা দিল্লীতে গেলে চট্ করিয়া চোখ পড়ে—অনেক লোকে মাথা গুঁজিবার কুঁড়ে বাঁধার স্থান পাইতেছে না আর মড়ারা বহু বিস্তৃত ভূমিতে বড়-বড় প্রাসাদে স্থায়ী বাসা বাঁধিয়াছে। ভূতের শাসনে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কোন-ঠেসা

হইয়াছে; কারখানাগুলি তাজা মানুষের ভোগের যে জমি দখল করিয়াছে, তাহার এক ইঞ্চিও কমাইতে গেলে ধর্মসংস্কারের নাড়ী ব্যথায় টন্‌টন্‌ করে।

ভারতের কোন দেশী রাজার রাজ্যে বা কোন দূর স্থানে ইউরোপীয় খ্রিষ্টিয়ানের দু-একটা কবর আছে কি-না, তাহা খুঁজিয়া-পাতিয়া নেওয়ার জন্যে ও টাকা খরচ করিয়া সেগুলি রক্ষা করিবার জন্যে গবর্ণমেণ্টের বিধান আছে। যে মরিয়াছিল, তাহার নাম-গন্ধ কেহ জানে না, তবুও সরকারি তহবিলে ভূতের বোঝা বহাইবার ব্যবস্থা আছে। তুর্কীর সঙ্গে সন্ধি করিবার সময়ে ইউরোপীয়েরা একটা ধারা বসাইলেন—যেন খ্রিষ্টিয়ানের কবর-খানা বজায় থাকে!

আগ্রা-দিল্লীর কথায় কেহ-কেহ স্মৃতিরক্ষার প্রয়াসের শিল্প-চাতুরীর কথা বলিতে পারেন। মড়ার নামেই হোক্ আর জীয়ন্তের নামেই হোক্ শিল্পীর দক্ষতায় যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে অবশ্যই স্থায়ী করিতে হইবে; তবে সে শিল্পের নিদর্শনের পদার্থটিকে ভূতের মিউজিয়ম না করিয়া জীয়ন্ত মানুষের উন্নতি সাধনের স্থান করিলে কোন গোল হয় না।

মানুষের এই উন্নতি সাধনের কথায় ভূতের বোঝার গুরু চাপের আর একটি দিকের আলোচনা করিতেছি। হিন্দুদের দানে চিরস্থায়ী ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর, অন্নসত্র, জলাশয়, মঠ ও ঠাকুর-মন্দির হইয়াছে ও হইতেছে; মুসলমানদের ওয়াক্‌ফ্‌ ও বিলেতে Endowment প্রভৃতিতেও অইরূপ ধরণের অনেক প্রতিষ্ঠান বসিয়াছে ও বসিতেছে। লোকসাধারণে এ ধরণের দানের মহিমা গাইতে শিখিয়াছে; এসকল দানের প্রতিষ্ঠান চিরস্থায়ী হইয়া যে অনেক স্থলে ভূতের বাসা হয় ও মানুষের উন্নতির বাধা হইয়া দাঁড়ায় সেটা বড় কেহ ভাবে না। মোটা

টাকায় পোষা চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠানের অহিতকর অবস্থার আলোচনা করিতেছি।

দানশীল হয় অল্পই কয়েকজন উদারচেতা লোকহিতৈষী ধনী ব্যক্তি। এই মহাপুরুষদের মহত্ত্বের সঙ্গে যে অনেক সময়ে অমঙ্গলে ভাব জড়াইয়া থাকে, তাহা গুণের দীপ্তিতে ঢাকা পড়ে। কথাটি সন্তান-বৎসল ভাল বাপ-মাদের দৃষ্টান্তে বুঝাইব। অনেক মা-বাপেরা চান্—তাঁহাদের সন্তানেরা ঠিক তাঁহাদের মনের মত গুণের মানুষ হইয়া ওঠে ; এজন্যে তাঁহারা ছেলেদের নানা দিকের স্বাধীন গতি বন্ধ করিয়া দেন্। বাপ-মাদের চেষ্টা সফল হইলে স্বয়ং বিধাতার নিতান্ত অনিচ্ছাতেও মানুষেরা এক ছাঁচে ঢালাই হইত, ও নূতন-নূতন মতের ও ভাবের বিকাশ হইত না।

ধরুন্—দানশীল রামবাবু খুব সাধু ; তিনি চান্ দেশের লোকেরা তাঁহার মনের মত ধর্ম-কর্ম মানিয়া সাধু হয়। সে সঙ্কল্পে তিনি চিরস্থায়ী ধর্ম-কর্মের প্রতিষ্ঠান বসাইয়া তাঁহার দানপত্রে এই সর্ত রাখিলেন যে, তাহারাই উপস্বত্ব ভোগ করিয়া প্রতিষ্ঠান রক্ষা করিবে যাহারা রামবাবুর নির্দিষ্ট ধর্মমত পালন করিয়া চলিবে ; এই-যে চিরকালের জন্য একযুগের ধর্মমত মন্দিরাদির পাঁচিলের পাথরের বেড়ায় ও উপস্বত্বের টাকার লোভের দড়িতে বাঁধিয়া দেওয়া গেল, তাহাতে প্রাচীন মত রক্ষা করিবার দিকে লোকের স্বার্থের বুদ্ধি বাড়িল, আর নূতন স্বাধীন মতের বিকাশে বাধা পড়িল। ভূতের চাপে ও মন্দিরের পাথরের চাপে মানুষের স্বাধীন গতি পিষিয়া মরিল।

কেহ যদি ৫০ বছর আগে এই সর্তে পাঠশালায় শিক্ষকদের পদ চিরস্থায়ী করিতেন—শিক্ষকদিগকে চিরকাল রস্কোর কেমিষ্ট্রি, গেনোর

ফিজিক্‌স্ প্রভৃতি পড়াইতে হইবে, তবে অতীতের বিদ্যা বজায় থাকিত,—নূতন জ্ঞান বাড়িত না। সৌভাগ্যক্রমে ইউরোপের মধ্যযুগের বিদ্যা ও খ্রিষ্টিয়ানি ধর্ম-বিশ্বাস কড়ায়-গণ্ডায় খাঁটি রাখিবার সর্তে বিলেতে বিশ্ব-বিদ্যালয় বসাইবার দান হয় নাই,—হইয়াছিল বিদ্যা বাড়াইবার জন্যে ; তাই নূতন-নূতন জ্ঞান বাড়িতে পারিয়াছে ও পারিতেছে। একযুগের প্রয়োজনের বিদ্যা অন্যযুগে জীয়ন্ত থাকিতে পারে—নাও পারে ; ভূতকেই তাজা রাখিতে গেলে ভূতের বোঝা বহিতে হয়, আর প্রত্নতত্ত্বটা পেত্নীতত্ত্বেই দাঁড়ায়। এক যুগের অন্নসত্র অন্যযুগের অলসের আড্ডা হইতে পারে, ও এক সময়ের জলাশয় অন্যযুগে অহিত-কর হইতে পারে। বিধাতার সৃষ্টিতে চলিয়াছে ক্রমবিকাশ, আর মানুষেরা আপনাদের দম্ভের মোহে চাহিতেছে নিজের জ্ঞানের চাপে ভবিষ্যতের বিকাশকে মারিয়া ফেলিতে।

এযুগে যাঁহারা প্রাচীন ধর্মমত মানেন না, তাঁহারা সকল সময়ে মনে রাখেন না—তাঁহাদের সুসংস্কার একদিন হয়ত কুসংস্কারে দাঁড়াইবে। সংস্কারকদের প্রতিষ্ঠানগুলি যদি এমন বাঁধা-নিয়মে ট্রষ্টীদের হাতে পড়ে যে সেগুলি বাঁধন এড়াইয়া স্বাধীনভাবে প্রসারিত হইতে না পারে, তবে প্রাচীনের মন্দিরগুলির পাথরের চাপে যেমন মানুষের স্বাধীনতা চাপা পড়িয়াছে, তেমনই ইঁহাদের মন্দিরগুলিও নগণ্য হইয়া চাম্‌চিকার বাসা হইবে, আর না-হয় সম্প্রদায়বিশেষ সে মন্দিরের ভূতের বোঝা বহিয়া মরিবে।

হিন্দুরা শ্মশানের পোড়া-কাঠকে কখনও আদর করে নাই ; বরং অপবিত্র ভাবিয়া দূরে ঠেলিয়াছে। প্রাচীনকালে এক সময়ে গোতম বুদ্ধকে স্রষ্টার আসনে বসাইয়া স্রষ্টাকে তাড়াইবার উদ্যোগ হইয়াছিল ; সে উদ্যোগে মহাপুরুষের মড়া শরীরের অচেতন টুক্‌রা কুড়াইয়া রাখার

ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অনুকরণে শরীরের ছাই-ভস্ম পুষিবার অসার প্রথার প্রচলন হয় নাই। মুসলমানদের দৃষ্টান্তেও ভারতের আর্য্যসভ্যতায় পুষ্টেরা গোর দেওয়ার প্রথা চালায় নাই। এযুগে ইউরোপীয়দের নকলে অইধরণের অসার কাজ করিবার একটু ঝোঁক্ বাড়িয়াছে আর শ্মশানে স্মৃতিমন্দির খাড়া করিবার চেষ্টা হইয়াছে। গ্রীক্‌ধরণের ছাই পুষিবার কাজটাও স্থানে-স্থানে হইয়াছে।

প্রাণের স্মৃতির ছাইভস্ম পুষিলে থাকে না। যদি স্মৃতির মন্দির গড়িতে হয় তবে সে মন্দিরে যাহাতে তাজা মানুষের উন্নতি সাধনের উপায় হয়, তাহা করিতে পার। হিন্দুর ব্যবস্থায় এক কাঠা জমিতে কোটি-কোটি মড়ার শরীর ভস্ম করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সারা দেশ জুড়িয়া জীবিতদের বাসা দুর্লভ করিয়া মড়ার আড্ডা গড়িবার প্রথা নাই। বৃথাই ভূতের বোঝা বহিও না।

চড়ক

ঘূর্ণিপাকে মাথার ফাঁকে উন্মাদনা জমিয়ে নিয়ে
গর্জনেতে গাজন-তলার চেঁচানিকে দমিয়ে দিয়ে—
শূন্য ব্যোমে ধ্বনি তুলে, ছোট্‌রে নূতন ভোলার চেলা,
সিদ্ধিলাভের ডিগ্‌বাজিতে চালাও নাগর-দোলার খেলা।

আবর্তনই revolution, ভাঙ্গ্‌ব ওতেই দম্ভ পরের ;
দে-পাক্, দে-পাক্, ঘুরুক্ বেবাক্ ব্রহ্ম হ'তে স্তম্ভ ঘরের

তীব্র ভাষায় বিশ্বে শাসাও ইস্পাতি ফ্রেম্ নুয়ে যাবে।
ভোলার মেলায় চল্‌রে চেলা, বুদ্ধি কি কেউ ধুয়ে খাবে !

বুদ্ধি সরু ? সে-ত গরু, মোটা কর মিহিটাকে ;
হোক্ সে খোঁড়া, ছোটাও ঘোড়া ডাক্‌বে উচ্চে চিঁহি রবে।
যতেক পুঁটে ছেলে জুটে করবে বন্দে-মাতার লড়াই
কলরবে প্রমাণ হবে বিশ্বজয়ী কথার বড়াই।

হুকুম দেদার—চল্‌রে জেতার আসনখানি টলিয়ে দিয়ে
নন্‌কো-পঙ্কে শঙ্কা-বাধা হুঙ্কারেতে তলিয়ে দিয়ে।
নয়রে নারী বিবর্জিতা, ন্যস্ত করাও অস্ত্র ঘাড়ে ;
শত্রুরা যে ভাদ্রবধূ আঁস্তাকুড়ের রাস্তা ছাড়ে।

অবিশ্বাসে-ছাঁদা ভাষে বিশ্বে কিরে কুশল আনে !
কথার নীরে ভিজ্‌বে চিড়ে মিল্‌বে হিন্দু-মুসলমানে ?
বাক্য বাঁকা যায়না ঢাকা, ঢাক্‌বে বিষের গোলাগুলি ;
নয় দেওয়ানা, দুই সেয়ানায় চালাও কিসের কোলাকুলি ?

মৌনব্রতের সাধন-পথে চলা মানা ; তাতে খালি
অন্ধকারে কর্ম বাড়ে ; নাই সেখানে হাতে-তালি।
উষ্ণ মাথাই বিশ্ব মাতায় ; মন্ত্র সাধন বন্ধ কর।
হে বেগবান্, নাই ভগবান্, দ্বন্দ্বে হিতের যন্ত্র গড়।

স্বামী অরবানন্দ পরমহংস

অতবড় জ্ঞানী ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ পৃথিবীতে কেহ কখনও দেখে নাই ; কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া অনীল এই কাহিনী যাহাদিগকে শোনাইতেছিল, তাহারা কেহ-বা হাঁ করিয়া, কেহ-বা ঘাড় বাঁকাইয়া, কেহ-বা অন্যবিধ ভঙ্গিতে শুনিতেছিল। অনীল বলিল—সেই মহাপুরুষের বয়সের গাছ-পাথর নাই, তিনি যে কবে কোথায় জন্মিয়াছিলেন ও কবে কোথা হইতে কাশীধামে আসিলেন, তাহা কেহ জানে না ; দেখিলে মনে হয় বয়স চল্লিশের অধিক নয়, কিন্তু সে অপূর্বের পিসীর মুখে শুনিয়াছে—মহাপুরুষের বয়স দু-শ' বৎসরের কম নয়, আর মোহন চাঁদ ঠাকুর বিশ্বাসী লোকের মুখে শুনিয়াছেন যে নিদানপক্ষে তাঁহার বয়স দেড়-শ' বৎসর হইবেই।

পঞ্চু জিজ্ঞাসা করিল—মহাপুরুষ নিজে তাঁহার বয়স কত বলেন? অনীল বলিল—আগেই ত বলেছি তিনি দুনিয়ার কোন লোকের সঙ্গে কথা ক'ন্ না, শতখানেক বছর নীরবে বসেই আছেন। পঞ্চু মাথা চুলকাইয়া বলিল—ঠাকুর নিজে কিছু বলেন নাই, তিনি কোথাকার লোক কেউ জানে না, তবে বয়সের অতবড় ফর্দ দিল কে? শ্রোতার দল চটিয়া হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল, আর গোবর্দ্ধন বলিল—পঞ্চু, তুমি তর্ক থামাও, মহাপুরুষের কথা শুন্‌তে দাও।

অনীল জাঁকিয়া বসিয়া বলিল—পঞ্চু, তুমি কিছুই জান না, বিশ্বাস কর না, আর কাশীশুদ্ধ সকল লোকে জানে, মহাপুরুষ না জানেন এমন বিদ্যা নাই, না জানেন এমন ভাষা দুনিয়ায় নাই। পঞ্চু বেচারা বিনীত

স্বরে বলিল—তিনি ত কথাই ক'ন্ না, তবে এত জ্ঞানের খবর লোকে কি পেটে বোমা দিয়া—? কথা শেষ না হইতেই সকলে পঞ্চুকে অনেক কটুকথা বলিল ; পঞ্চু চুপ করিল।

অনীল বলিতে লাগিল—মহাপুরুষ কিছুই খান্ না, এক ফোঁটা জলও নয় ; কত লোকে দুধ আনিয়া দেয়, ফল আনিয়া দেয়, মিষ্টান্ন সামগ্রি দেয়, টাকা পয়সা প্রণামি দেয়, মহাপুরুষ তাহার কিছু স্পর্শ করেন না। পঞ্চু জিজ্ঞাসা করিল—তাঁহার চেলারাও নয় ? জিনিসগুলি কোথা যায় ? অনীল বুঝাইয়া দিল যে, লোক-জন চলিয়া গেলে মহাপুরুষ ভক্তদের তুষ্টির জন্য মনে-মনে মন্ত্র পড়িয়া একবার ছুঁইয়া দেন্, আর সে-সব জিনিস-পত্র ও টাকাকড়ি আকাশে ও বাতাসে মিলাইয়া যায়। পঞ্চু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—বুঝিলাম। পঞ্চুর সুমতি দেখিয়া শ্রোতারা সুখী হইল।

অনীল বলিল—ঠাকুর একেবারে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। তিনি ইচ্ছা করিলেই আকাশে উড়িতে পারেন, এক মুহূর্তে দূরদেশে গিয়া ফিরিয়া আসিতে পারেন, ইত্যাদি। কুমতি আবার পঞ্চুর ঘাড়ে ভর করিল,—পঞ্চু জিজ্ঞাসা করিল, অনীল তাঁহাকে উড়িতে দেখিয়াছে কি-না। অনীল হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল—আরে আহাম্মক, সে কি হয়! মহাপুরুষকে আকাশে দেখ্লেই যে একেবারে লোকের মুক্তি হয়ে যাবে ; তিনি কি লোককে তা' দেখান্! পঞ্চুর ঘাড়ে কুমতির বোঝা বাড়িল ; সে বলিল—ইউরোপের লোকেরা ত এরোপ্লেনে উড়িতেছে ; তাহারা কি পরমেশ্বর ? কত চোর-ডাকাত নিমেষে এরোপ্লেনে দূরে যাইতে পারে। এখন আমরা দূরের পথে অল্পসময়ে রেলে যাই ; তাহাতে কি চোর সাধু হয়, না, মনুষ্যত্ব বাড়ে ? আত্মা যদি এই মাটির শরীরটাকে হাওয়ায় না উড়াইয়া মাটির পৃথিবীর অন্য কিছু হাওয়ায়

উড়াইয়া তাহাতে মায়-শরীর চড়িতে পারে, তবে প্রভেদ রহিল কোথায়? অনীল একথা শুনিয়া বলিল—তবে তুমি যোগবলে মুক্তিলাভের কথা মান না; তুমি নাস্তিক। শ্রোতারা একবাক্যে বলিল—পঞ্চু অতি পাষণ্ড, তাহার মুক্তি নাই।

অনীল এবার পঞ্চুকে ঢিট করিবার জন্যে বলিল—তুমি জান পঞ্চু, এই মহাপুরুষ কতবার-যে রূপ বদ্‌লাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই; পরমেশ্বর না হইলে তাহা কেহ করিতে পারেন? এই যাহারা একবার তাঁহাকে দেখিয়াছে, তাহারা কয়েক বৎসর পরে দেখে সে মূর্তি আর নাই, যেন আর-একজন ঠিক সেই স্থানে গট্ হইয়া বসিয়া-আছেন। পঞ্চু এবারে সুমতি পাইয়া বলিল—ঠিক বুঝিতেছি যে, একদল ব্যবসায়ী নূতন-নূতন অরবানন্দ আনিয়া জোটায় না। আমিও এইরকমের একটা সত্য কথা ইংরেজিতে পড়িয়াছি। গ্রামের বাহিরে একখানি কুঁড়ে-ঘরে একজন ডাইনী থাকিত, ও সেই ডাইনীর বাড়ীতে কেবল একটি বিড়াল ছিল। লোকেরা স্পষ্ট দেখিয়াছে যে এক-এক সময়ে ডাইনীটি বিড়াল হইয়া বসিয়া থাকিত।

এবারে সকলে পঞ্চুকে ধন্য-ধন্য বলিল ও একবার অরবানন্দের পা ছুঁইয়া সকলে মুক্তি লাভ করিবার আগ্রহ দেখাইল।

পাশা খেলা

[নবরসের রচনা]

অদ্ভুত রস

পাশা খেলা টলায় বেলা, খেলুড়ে নড়ে না।
উৎসাহেতে সিংহবাবু, নাচিয়ে হাড় চেঁচিয়ে কাবু ;
ছ-তিন-নয়, সতের-ষোল আদপে পড়ে না।

বীভৎস রস

কহিল কেশে' সিংহ শেষে ধুত্তোরি রে ছাই !
পড়িলে পাশা—জেতে ত চাষা, এখন উঠে যাই।

রৌদ্র রস

ঢুকিল পরে রান্না ঘরে দৈবে তুলে' হাই ;
গিন্নি ক'ন্—জিতিলে রণ ক্ষিদে কি থাকে ছাই ?
আর কে দেখে ! দাঁড়াল বেঁকে সিংহ বেতরো—
হবই আমি বিদেশগামী, পার ত কে ধরো !

ভয়ানক রস

নাড়িয়ে হাত ছাড়িয়ে ভাত চলিল সজোরে ;
পিছন থেকে গিন্নি দেখে হাসির নজরে—

কাপড়গুলি গুছিয়ে তুলি' পোঁট্‌লা বাঁধিয়া
চলিল বেগে বেজায় রেগে গোঁফেতে তা দিয়া।

আদি রস

এগিয়ে এসে গিন্নি হেসে ধল্লে সেগুলি,
একটি হাত প্রসারি' নাথে রাখিল আগুলি।

বীর রস

ক্রোধে অধীর হইল বীর, কথা না মানিল ;
বেজায় জোরে আঁক্‌ড়ে ধরে 'বোঁচ্‌কা টানিল।
হেঁচ্‌কা-টানে বোঁচ্‌কা নিতে মচ্‌কে গেল হাত ;
ছট্‌কে পড়ে' সিংহ যে-রে ভূমিতে চিৎপাৎ।

করুণ রস

অঙ্গে ব্যথা ! সিংহ কথা কহিছে কাতরে—
হলেম্ খুন, হলুদ্-চুন্ আন্‌তে যা'ত-রে !
দু-চারি ঘটি জলের ছিটা, পাখার বাতাসে ;
হলুদ্-চুন্-পটির গুণে তুলিল মাথা সে।

বাৎসল্য রস

ঝাড়িয়া দিল গায়ের ধূলা হস্ত বুলায়ে,—
রহিল তবু সিংহ-বাবু ওষ্ঠ ফুলায়ে।

শান্ত রস

দিলেন হেসে গৃহিণী শেষে পথ্য থালাতে ;
যতেক খান্, আবার চা'ন্ ক্ষুধার জ্বালাতে।
হাঁড়িটি বেশ করিয়া শেষ, গুড়ুক্ ফুঁকিল
ধূমে ও ঘুমে সকল গোল্ যাহোক্ চুকিল।

হেঁচ্ছ

দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠ জাতি হচ্ছি মোরা হিন্দু ;
প্রমাণ—আছে হিমালয়, বিন্ধ্য, গঙ্গা, সিন্ধু।
ভূগোল দেখ ! অন্য দেশের নামগুলি সব ম্লেচ্ছ।
বাহবারে ! ভেবে-চিন্তে ঠিক বলেছ ! হেঁচ্ছ।

ওরা করে দাপাদাপি, মোরা ভারি ঠাণ্ডা ;
ওদের দুঃখে কাঁদি,—নহে দেখে' কারও ডাণ্ডা।
মুখ থাক্‌তে হাতাহাতি, উচ্চ জাতির তেজ্জ।
বাহবারে ! ভেবে-চিন্তে ঠিক বলেছ ! হেঁচ্ছ।

ওরাই বলে—মোরাই শুধু ধ্রুব-লোকের যাত্রী ;
চক্ষু বুজুক্—ধ্যানে তবে কিবা চাষী, শাস্ত্রী।
ওরা ভৃত্য,—যোগাক্ নিত্য চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য।
বাহবারে! ভেবে চিন্তে ঠিক বলেছ ! হেঁচ্ছ।

ওঁ-কার তত্ত্ব

ব্রহ্মার মানস-সরোবরে হাঁসেরা হাসিয়া বলিল—মানুষদের এ-কি কীর্তি! ঠাকুরের বেদের মন্ত্র গান করিবার আগে, আঁ-উঁ করিয়া যে স্বরটুকু ভাঁজিতে হয়, সেটুকু জমাট করিয়া ওঁকার করিয়াছে।

ব্রহ্মা এই পেঁক্‌পেঁকি তত্ত্বে চটিয়া তাঁহার ডাঙ্গার আবাসে ব্রহ্মাবর্তে সরস্বতীর কূলে, আকাশ-পাতাল প্রমাণ ভূর্জ পত্রে ওঁ-কারের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-লিখিয়া ফেলিলেন। অত বড় বই ধরাইবার লাইব্রেরি না পাইয়া ঠাকুর সেখানা সরস্বতীর ঘাড়ে চাপাইয়া মানস-সরোবরে গেলেন।

একদিন মায়-ব্রহ্মা সকল দেবতারা তত্ত্বের বই খুঁজিয়া সরস্বতীকে ডাকিলেন; আর সরস্বতী! তত্ত্বের বই রৌদ্রে, বর্ষায় বালি হইয়া গিয়াছে, আর সে বালিতে সরস্বতী চাপা পড়িয়াছেন। দেবতা ও দেবতাদের বাহকেরা বালি খুঁড়িলেন; লাভ হইল কেবল নিজেদের গায়ে বালি লাগা,—অর্থাৎ ওঁ-কারের অনুনাসিকের ছিটে-ফোঁটা লাগিয়া যাওয়া।

শঙ্করের মাথার মাঝখানে—'ক'-এর উপরে লাগিয়া গেল 'ঙ'; আর কার্তিকের ময়ূরের পাখায় লাগিল 'ঞ'; সেইজন্য আমরা শিশুবোধকে পড়ি—'ঞ'-এ ময়ূর। বিষ্ণুর পিঠে লাগিল 'ণ' তিনি সেটা ঞ-এর পালানের মত থলে দিয়া ঢাকিলেন; এখনও তাঁহার নামের ষ-এর পিছনে সেটা আছে। কৃষ্ণ যে বিষ্ণুর অংশ, তাহা এই পিঠের থলে দেখিয়া প্রমাণ হয়। মহাদেবের বৃষভের বা নন্দীর শিং-এ বা পেটে 'ন' লাগিয়া গেল, আর সেই 'ন' ইন্দ্রের কেবল পেটে

লাগিয়াছিল। ইন্দ্রের ঐরাবতের শুঁড়ে লাগিয়াছিল ঁ (চন্দ্রবিন্দু)-টুকু। ব্রহ্মার নামের 'হ'-এর পায়ের তলায় লাগিল সাকার 'ম'; তাহার ফলে নিরাকার ব্রহ্মের একটা আকার হইল। লক্ষ্মীর গায়েও সেই 'ম' লাগিয়াছিল; তবে সেটা ঈ-কারের ঘোম্‌টায় ঢাকা পড়ায় আমরা বাঙ্গলায় বলি লক্‌খী।

দেবতারা যাহা পাইবার তাহা পাইলেন, কিন্তু তত্ত্বের উদ্ধার হইল না। সরস্বতী যদি ব্রহ্মাবর্তে না থাকিয়া বরেন্দ্র ভূমে খলিমপুরের কাছে থাকিতেন, তবে এতদিনে তিল-তিল বালির কণায় তাল রচিত হইয়া অনেক তত্ত্বের বই হইত, আর সরস্বতীও বালি চাপা পড়িতেন না।

কোঁচা-মাহাত্ম্য

পরিচ্ছদের বাহার কোঁচা লাগে কত হিতে গো;
আটপৌরে উত্তরীয়, পিঠ-বস্ত্র শীতে গো।
বর্ষা-রোদে মাথার ছাতা—ঘোম্‌টা যেন শাড়ীতে;
হয় সে রুমাল—মুখ মুছিতে আর নাসা ঝাড়িতে।

স্নানের গাম্‌ছা, আর লাগে সর্‌বতাদি ছাঁকিতে;
কোঁচোড়ই প্রশস্ত, নানা জিনিস-পত্র রাখিতে।
হাঁচির কাঠি, কান্‌-খুস্কি,—পাকিয়ে নিলে আগা-টি
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে কোমর বন্ধ, সর্পাঘাতে তাগা-টি।

গুটিয়ে কোঁচা শুষ্ক বস্ত্রে যাই নদীর পারে গো।
সাধিতে এতেক কাজ পেণ্টুলেনে নারে গো।
ভূঁয়েতে বিছানা কোঁচা,—মহিমার অন্ত নেই ;
ছুঁচার কীর্তন চাপা পড়ে ওর পত্তনেই।

পূজার বাজার

আমাদের উপাধি পোদ্দার, তবে কাজটা পোদ্দারি নয় ; আমরা তিন-চার পুরুষ ধরিয়া এই কলিকাতা শহরে দোকানদারি চালাইতেছি, —নিজেদের টাকায়, পরের ধনে নয়। যে বিবরণ দিতেছি, তাহাতে টেক্‌স্ বাড়ার ভয় থাকায় দোকানের ঠিকানা দিলাম না।

বিলাতের নানা দেশের কল-কারখানায় যে-সব জিনিস তৈরি হয়, তাহাই চিরদিন আমাদের দোকানের পুঁজি। পঞ্চাশ বছর আগে যখন ঠাকুরদাদার আমলে কৌতূহলে দোকান দেখিতে যাইতাম, তখন বিলাতির কদর ছিল খুব বেশি ; পারতপক্ষে ধনী লোকে দেশী জিনিস কিনিত না। কিন্তু সেদিনকার তুলনায় আমাদের দোকান হইয়াছে উই-এর ঢিবির তুলনায় পর্বতের মত। বাবার আমলে যখন দোকানদারিতে হাতে-খড়ি হয়, তখন পুরানো চীনে বাজারের মোড় থেকে আমাদের বাজারের রাস্তায় যত খদ্দের চলা-ফেরা করিত, চেষ্টা করিলে তাহা গণা চলিত ; কিন্তু এখন চলে না। ধরুন, এখন লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে পাঁচগুণ কিন্তু আমাদের আয় বাড়িয়াছে

পঁচিশ গুণ। স্বদেশী হইল, ও স্বদেশীটা স্বরাজে বাড়িয়া উঠিল, কিন্তু তাহাদের বৃদ্ধির অনুপাতের চেয়ে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে অধিক।

আমি স্বরাজের তহবিলে চাঁদা দিয়া থাকি, আর সেই খাতিরে অনেক স্বরাজ-সাধক আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন; তবে জিনিসগুলি বাঁধিয়া নেন্ খদ্দরে। আমার বাল্যবন্ধু সাহা মহাশয়ের দোকানে বিলেতী লাল-লাল ঝাল-ঝাল পদার্থবিশেষ যেমন গেরুয়া ও নামাবলীতে চাপা পড়িয়া পাচার হয়, ঠিক সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ লুকোচুরির খেলা করে হাজারকরা একজন, আর বুক ফুলাইয়া সওদা করে বাদবাকি সকলে। সাহাজীর দোকানে যেমন অনেক বেপরোয়া ফোঁটা-মালা দেখা দিয়া থাকেন, আমার দোকানেও তেমনই খদ্দরধারীর অভাব নাই।

স্বদেশীর জয়-জয়কারের দিনে আমার এক দরিদ্র বন্ধু একটি নামজাদা স্বদেশী দোকানে কাজ করিত; দোকানের মালিক তাহার মারফতে আমাদের দোকানের অনেক খেলো-মাল কিনিতেন, আর সেগুলিকে স্বদেশী নাম দিয়া ডবল দামে বেচিতেন। দেশী দোকানের নাম ছাপ দিয়া বিলেত থেকে মাল আমদানি করার যে কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা এদিনেও কোন-কোন মহাজন হয়-ত ভোলেন্ নাই।

স্বদেশী বাড়াইবার চেষ্টায় এ প্রবন্ধ নয়; আমার উদ্দেশ্য—অভিজ্ঞতার কথা বলা আর দেখাইয়া দেওয়া যে এদেশের অবস্থা অটল পাহাড়ের মত নানা আন্দোলনের ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যে একই ভাবে রহিয়াছে। আমাদের ছেলেবেলায় যখন সমাজ-সংস্কারের নূতন উদ্যোগ দেখা দিল, তখন গুপ্ত-কবির প্রভাকরে পড়িয়াছিলাম—হয় দুনিয়া ওলট্-পালট্ আর কিসে ভাই রক্ষা হবে; কিন্তু দুনিয়া

উল্টাইল না, যেমন ভাবে চলিতেছিল বা ঘুরিতেছিল, সেই রকমেই চলিল। গুপ্ত-কবি বলিয়াছিলেন—আছি ক'জন বুড়া য'দিন, ত'দিন কিছু রক্ষা পাবে ; কিন্তু সেদিনের বুড়াদের পৌত্রেরা প্রপিতামহ হইলেন, তবু আমাদের ধারা বদ্‌লাইল না। এখনও সেই একই বুলি শুনিতে পাই—গোটাকতক বুড়া বিদায় নিলেই দেশের কাঠাম বদ্‌লাইবে। হয়-ত আমার একজন পণ্ডিত খদ্দেরের কথা সত্য যে, যে কারণে ও উপায়ে বিপ্লব ঘটে তাহা এদেশে নাই বলিয়াই কথার জল কথায় মিশায়। আমি সে গবেষণার ধার ধারি না ; আমি বলিব যাহা দেখিয়াছি।

প্রথমে আমাদের দোকানের দিক্ দিয়া দেখি। একই ভাষায় আমাদের ফড়ে দালালেরা খদ্দের ডাকিতেছে, খদ্দেরের চলা-ফেরার ও কেনা-কাটার একই ধরণ, আর আমাদের খদ্দের-ভুলাইবার সেই একই বুলি। 'এখন দর-দস্তুরের দিন নাই,' 'এক কথায় জিনিস বিক্রি', 'আমরা খদ্দের চিনেই কথা কই,'—প্রভৃতি সমানে বজায় আছে। একটু খাতিরের বা পরিচিত লোক দোকানে আসিলে সেই আগেকার মত একটু চোখ টিপিয়া ও কানের গোড়ায় ফিস্‌-ফিস্ করিয়া দুটা কথা কহিয়া খাতায়-লেখা দামের উপর সবে এক আনা মুনাফা ধরিয়া বেচিবার কথা শুনাইয়া, আগেকার মতই এক টাকার মাল দেড় টাকায় বেচিয়া খাতির বজায় রাখিতেছে। রাস্তার লোকের স্রোত, ডাক-হাঁক কথা-বার্তা, এমন হুবহু একই ধরণে চলিয়াছে যে, আমার পিতামহ যদি ওপার হইতে সোজা এই রাধাবাজারে আসিয়া দাঁড়াইতেন, তবে তিনি মনে করিতেন যে, এক রাত্রের ঘুমের পরেই তিনি এখানে আসিয়াছেন।

আমার দোকান ছাড়িয়া একটা এ-কালের বড় সংস্কারের আড্ডার

কথা বলিতেছি। সেই আমাদের পাড়ায় ছিল একটা ব্রাহ্ম সমাজ ; আমরা যেমন ছেলেবেলায় কোন রকম তামাসার বা হুজুগের জায়গায় একবার না গিয়া ছাড়িতাম না, একালেও ঠিক সেই আমাদের মত নানা গল্প ও ফুক্কুড়ি করিতে-করিতে দলে-দলে ছেলেরা সেই ব্রাহ্ম-সমাজে ঢোকে। আর সেই সেকালের মত একই সমালোচনা করিতে-করিতে ঘরে ফেরে। পাড়ার বারোয়ারিও যেমন, মাঘোৎসবেও তেমন,—সকল পর্বে ভিড় বাড়াইবার জন্য বহু বেকার বাস করে। গোপাল মাষ্টারের মত কেউ ইংরেজি জানে না, হরিপণ্ডিত বড় মূর্খ, আফিসের বড় সাহেব হেমবাবুর হাত-ধরা, ভাল সাহেবেরা গোমাংস খায় না, সেকালের মত আর হয় না—এই সকল একই কথা নিয়া তর্ক ও মারামারি সেকালে-একালে সমানে চলিয়াছে। যদি একালের রাস্তা-ঘাটের চলা-ফেরার ফটো তুলিয়া ও পথের লোকের কথাবার্তার ফনোগ্রাফ্ নিয়া পিতৃলোকের পারে পাঠানো যাইত, তবে নিদানপক্ষে আমার পিতামহ ভাবিতেন যে তাঁহার মৃত্যুর বছরের ফটোগ্রাফ্ ও ফনোগ্রাফ্ পাইয়াছেন।

দুনিয়া উল্টাইল না, জনকতক বুড়ার মৃত্যুতেও এদেশ বিলেত হইল না, আর অনেক ডাকে-হাঁকেও একটা নির্দিষ্ট দিনে পর-রাজ উঠিল না। সকল আন্দোলনেই, শুনিয়া আসিতেছি যে অতবড় আন্দোলন আর হয় নাই, কিন্তু হুজুগে যাহাদের বেকারত্ব ঘোচে, তাহারা ছাড়া কয়জন সেই আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ-এ উঁচুতে উঠিয়াছেন, তাহার খবর রাখি না। প্রায় বাষট্টি বছর আগে আমাদের হেদোর বড় পাদ্রি সাহেব বলিয়াছিলেন—তাঁহার বাণীর ষাট বছর পরেই এদেশের দুর্গা-পূজা উঠিয়া যাইবে ; মেয়াদের দিনের পর দু' বছর কাটিয়া যাওয়ায় সাহস করিয়া লিখিতেছি—স্থানে-স্থানে নৈবেদ্যের

বরাদ্দ কমিয়া ফের্পোর বরাদ্দ বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু দুর্গা-পূজা ওঠে নাই, আর বিবৃদ্ধ গতিতে ধনে-জনে-মানে বাড়িয়া চলিয়াছে আমাদের পূজার বাজার।

উঃ বা উঁ

উন্নতি চাই ? এস সবাই স্থুরু করি চলা ;
উল্লাসেতে নাচিয়ে ধরা, চেঁচিয়ে ফাটাই গলা।
উদাম পথে কোথায় গতি, ভাবিসনে তুই বোকা ;
উচ্চে শুধু গর্জে চল্ বৃদ্ধ, যুবক, খোকা।
উপ্‌ড়ে ফেল্ গাছের শিকড়, পাকড়ে পাহাড় পিঠে ;
উজাড় কর বাজার আর ঝুপ্‌ড়ি সহ ভিটে।
উল্টে দিয়ে বিশ্বখানা নস্য করিস্ পরে ;
উষ্ণ কিন্তু হোস্‌নে তোরা,—হিংসা যেন মরে।
উপোস করে' থাকিস্, দিতে শয়তানকে ফাঁকি ;
উড়্‌বে বাধা,—পড়্‌বে খাসা আত্মারামের পাখী।
উদার বক্ষ, চওড়া পৃষ্ঠ বাড়াও ঘুষি কিলে ;
উঁ শব্দটি করিস্‌না কেউ, ফাটে যদি পিলে।

উপাধি

উপাধি খসিলেই মুক্তি ; প্রাচীন দর্শনের এই উক্তি ধরিয়াই হয়ত শ্রীযুক্ত গান্ধীজী সকলকে উপাধি ছাড়িতে বলিয়াছিলেন। আমাদের বুদ্ধির রাম, কিন্তু উল্টা বুঝিলেন,—আমাদের তলার উপাধি ঘাড়ে চাপিল ; উপাধিগুলি শব্দের প্রত্যয়ের মত নামের শেষে না বসিয়া উপসর্গ হইয়া আগে দাঁড়াইল। একালে নিরুপাধি মুক্ত পুরুষদের শাদা নাম উচ্চারণ করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়,—একঘরে হইতে হয়,—একগাদা উপসর্গ বসাইয়া নাম করিতে হয়। উপ+আধি, এখন অতিরিক্ত উপসর্গের জোরে হইতেছে উপব্যাধি। টিক্‌টিকির লেজ কাটিলে যদি উহার মাথায় ঝুঁটি গজাইত, তবে ঘরের দেয়ালে একটা আজগুবি অ-লাঙ্গুল কৃকলাসের বিভীষিকা বাড়িত।

বেঙ্গাচির যাহা খসিলে সে মুক্তির জলে লীন না হইলেও লাফাইয়া বেড়ায়, সাধু পুরুষদের তাহা খসিবার নয়। স্বয়ং ব্রহ্মকেও উপাধির জোরে, উপসর্গের জোরে ও নামের জোরে বাঁচিতে হইতেছে। আমরা ঠাকুরকে চাই না, চাই তাঁহার নাম ; তাই তাঁহার নাম-সুধারস পান করি, আর গান করি সদা হরি "নাম"। ঠাকুরের নিজের গুণে নয়,—তাঁহার নামের গুণেই গহন বনে শুষ্কতরু মুঞ্জরে। উপাধির জোর না থাকিলে, ব্রহ্মকেই ব্রহ্মসাগরে মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করিতে হইত। কাজেই হরি হইতে হরির পিতৃব্য পর্য্যন্ত সকলেরই উপাধি চাই।

ঠাকুরবর্গে নিরুপাধি আছেন এক ঘেঁটু। বেদ পুরাণে যাহার তত্ত্ব

পায় না, তিনি যখন সকলের বড়, তখন ঘেঁটুর চেয়ে বড় আর কে আছে? উহার গায়ে সংখ্যা-কারক-বোধয়িত্রী বিভক্তি নাই, কোন লিঙ্গবাচী প্রত্যয় নাই, আর উপসর্গের বালাই নাই; কোন ব্যাকরণের সাধ্য নাই, ঠাকুরের ব্যুৎপত্তি ধরে। যাঁহার উৎপত্তির ইতিহাস নাই, কোন শাস্ত্রে যাঁহার তত্ত্ব মেলে না, তিনি যে কত বড়, তাহা দার্শনিকেরা ও ভক্তেরা বুঝিবেন। ইঁহার পূজার উৎসবে বিনা আয়োজনে, অঞ্জলি-রূপে গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে, আর স্তুতির মন্ত্রে কোকিল ও ঘুঘু ডাকিতেছে।

বারমেসে

মানুষে পায় ধরা-বাসে বারমাসই শাস্তি,
তবুও জানি ভগবানই ন্যায়বান জাস্‌তি।
তেতে-পুড়ে ঘেমে-চেমে সারা মোরা গ্রীষ্মে;
কোনক্রমে আমে-জামে টিকে থাকি বিশ্বে।
পরে—শব্দ দমাদম্, ঝমাঝম্ বর্ষা;
মেলে না-ক কোন ফল শসা শুধু ভর্‌সা।
বর্ষাধারে উঠে বেড়ে তাল-পাকান তাত্‌-রে;
চচ্চড়ে রোদ্দুরে মাথা ফাটে ভাদ্রে।
আশ্বিনটি ছুটির মাস—দাঁড়ায় না হৃদণ্ড;
স-ডাক্তার মেলেরিয়া কার্তিকে প্রচণ্ড।

অঘ্রাণেতে আবার আফিস্, ঘরে কাঁদে বৌ সে ;
শূলের ব্যথা পেটে-পিঠে—খেয়ে পিঠে পৌষে।
মাঘে বিষম মাগ্‌গি পশম, খদ্দরকেই আঁকড়াই ;
তাই যদি ছাই সস্তা হ'ত কমলালেবু কাঁক্‌ড়াই।
বসন্তেতে ভন্‌ভনানি বাড়ায় মাছি-মচ্ছর ;
ঢাকের কাঠির চোটে কাটে বারমাসের বচ্ছর।

বোকারাম

বকুবাবুটি আস্ত বোকারাম ; তিনি ভাবেন, তিনি বুদ্ধিমান বড় মানুষ, আর আমি নাকি আহাম্মক ও ছোটলোক। বকুবাবু অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন, আর সেই টাকা কিসে চুরি না যায়, তাহার জন্য প্রথমে গড়িলেন ইট-পাথরের পাকা বাড়ী, আর সেই বাড়ীতে রাখিলেন লোহার সিন্দুকে চাবি দিয়া টাকা ও ঘরে চাবি দিয়া রাখিলেন নানারকম আহার্য্য সামগ্রি। তবুও সেসব চুরি যাওয়ার ভয়ে বাবুর শান্তি নাই,—তিনি বাড়ীতে দারোয়ান রাখেন ও রাত্রে চাবি দিয়া বাহিরের ফটক বন্ধ করেন। আমার এসব দুশ্চিন্তা নাই,—আমি টাকাও পুষি না, ধান-চালও রাখি না, পাকা বাড়ী-ঘরও করবার দরকার হয় না ; আমি আনন্দে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে বাবুর বাড়ীতে গিয়া কাঠ কাটি, জল তুলি ও কাজ করিয়া দেখাই যে, বাবু দুর্বল শরীরে তাঁহার প্রয়োজনের যে কাজ করিতে পারেন না, আমি সবল শরীরে তাহা করিতে পারি ; আমি আনন্দে স্বাস্থ্য বাড়াই, আর আমার যে টাকা

বোকা বাবুদের ঘরে-ঘরে সঞ্চিত আছে, তাহা প্রয়োজনমত নিয়া থাকি। পৃথিবীর বাজারে দোকানে-দোকানে আমার জিনিস-পত্র মজুদ আছে ও সেগুলি রক্ষা করার চিন্তা আমার নাই। সকল দোকান-দারেরা আমার চাকর, অথচ প্রতিমাসে মাহিনার টাকার জন্য আমাকে বিরক্ত করে না। আমার যখন যে জিনিষ যতটুকু দরকার হয়, তাহা আমার চাকরদের দোকান হইতে আনি, আর সেই সময়ে চাকরদের মাহিনা বাবদে কিছু-কিছু দিয়া থাকি। পৃথিবীর সকল সম্পদ আমার কাছেই, কাজেই আমি বড় লোক; প্রয়োজনমত চাকরদের মাহিনা বাবদে কিছু-কিছু দিলে আমার দরকারের জিনিষ আমি নির্ভাবনায় পাই। আমি নিরাপদ ও বুদ্ধিমান, আর বকুবাবু যখন ভূতের বোঝা বহিয়া দুর্ভাবনায় সময় কাটান্, তখন তিনি আস্ত বোকারাম।

মানে কি

অগন্‌তি অই তারার পুঞ্জ শূন্য পথে একঘেয়ে—
চর্‌কি কলে ঘুরে চলে, ডিগ্‌বাজি খায় পৃথিবী।
দুর্‌বিনে তার স্বরূপ ধরিস্? যত পারিস্ দেখ্ চেয়ে;
গতির তত্ত্ব ধুনে-ধুনে 'কেন'-র মানে কি দিবি?
তত্ত্বে কুশল জ্ঞানের মুষল বাড়িয়ে চলে কচ্‌কচি,—
শব্দ-ইটের শুর্‌কি কোটে সূক্ষ্ম ঢেঁকি দর্শনের।

কান পাতিনে ঢেঁকির পাড়ে, পদ্যপাঠের পদ রচি ;
সইতে নারি ঘর্‌ঘরানি তর্ক-চাকার ঘর্ষণের।
দুঃখ-শোকের ধূলা ওড়ে রাস্তা জুড়ে মেঘপানা,
কোন মতে পথের পথিক, রথের গতি থামে না ;
দৃষ্টিপারের ভবিষ্যতের পানে ছোটে একটানা,
জানে না তার মানে কি-বা, তবুও মাথা ঘামে না।
প্রাণের তাপে ভাবের ধোঁয়া শিখা বাঁধে মট্‌কাতে,
ঠাণ্ডা পেয়ে আবার গায়ে পড়ে শিশির বিন্দুতে।
প্রশ্ন যাহা জবাব তাহাই ; বুদ্ধি ধোঁকে খট্‌কাতে ;
পাকে-পাকে জড়িয়ে থাকে কথার মানে কিন্তুতে।
জুট্‌তে হবে ছুট্‌তে হবে—চলার শক্তি রাখ্‌ তাজা ;
ঘুর্‌বি ভোঁ-ভোঁ—যাত্রা শুভ ; পথের খবর খুঁজিস্‌ নে।
মিলে সবে মহোৎসবে চড়কতলায় ঢাক বাজা ;
মিছে ভাবিস্‌—কেন মাতিস্‌, কিছুই যদি বুঝিস্‌ নে ?
শূন্যে বোঁ-বোঁ—মাথায় ভোঁ ভাঁ ? হেথায় অন্য বাদ্য নাই।
ওরে হাঁদা, কোকিয়ে কাঁদায় বিশ্ব-ধাঁধা টোটে না।
চল্‌রে আগে—আরও আগে, উল্টে চলার সাধ্য নাই ;
ধাতার সাথে বাদ-বিবাদে নিগূঢ় মানে ফোটে না।
প্রশ্ন কিসের ? ছোট্‌রে হেঁসে যতই থাকুক্‌ অন্ধকার ;
নিগূঢ় টানের গভীর মানে—কি পাবি তুই, কি দিবি ?
চল্‌ বলবান জয় ভগবান—গেয়ে গীতি বন্দনার,
যতই জোরে যাক্‌ না দূরে শূন্যে ঘুরে পৃথিবী।

ধর্মের খেলা

(লাভ শিকারের কুৎসিত গল্প)

কেদারনাথ, রমণকৃষ্ণ ও ঈশান একদিন বুদ্ধি আঁটিল—তাহারা মুসলমান হইবে। অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল এই—কেদারের ডিপুটিগিরি পাইবার চেষ্টা বিফল হইয়াছিল, মক্কেলহীন রমণকৃষ্ণের মুন্সিফি পাইবার আবেদন নামঞ্জুর হইয়াছিল, আর ঈশান বেচারার কপালে একটা মাষ্টারিও জোটে নাই। তাহারা যেদিন বুঝিল যে উত্তর-পূর্ব ছাড়িয়া পশ্চিমের দিকে মুখ ফিরাইয়া আরবী ভাষায় ঈশ্বরকে ডাকিলে সরকার বাহাদুরের নেক্-নজরে পড়া যায়, তখন তাহারা একদিন কল্‌মা পড়িয়া মুসলমান হইল ; কেদারের নাম হইল কাদের, রমণকৃষ্ণ নাম পাইল রহমন, আর ঈশান হইল ঈশা।

তিনজনেরই কপাল খুলিল : তাহারা যথাক্রমে ডিপুটি, মুন্সেফ ও প্রোফেসর হইল। নসিবের জোরে তিনজনেই যখন একবৎসরের মধ্যে আপনাদের কাজে পাকা হইল, তখন আবার তাহারা ভোল্ ফিরাইয়া হিন্দু হইবার উদ্যোগ করিল। ঈশানের ইচ্ছা ছিল—বিশুদ্ধানন্দকে ডাকিয়া শুদ্ধির হুজুগ করিবে, কিন্তু কেদার বুঝাইল যে, শুদ্ধির চেয়ে বুদ্ধির জোর অধিক। একালের হিন্দু-সমাজে পুরুষদের কোন লীলা-খেলায় যে কিছু বাধে না, তাহা তাহারা গোড়াগুড়িই জানিত, আর জানিত বলিয়াই চাকরি পাইবার ফিকিরে কল্‌মা পড়িয়াছিল। রমণকৃষ্ণের উপদেশে তিনজনেই এফিডেবিট্ দাখিল করিয়া আপনাদের আগেকার নাম ও ধর্ম ফিরাইয়া নিল।

এই কাণ্ড দেখিয়া আঞ্জুমান্-উল্-জাহান্ বেইমানদিগকে চাকরি হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তখন সরকারের কাছে তাহাদের চাকরি হইয়াছিল factum valet, আর তাহা ছাড়া ধর্মের অদল-বদলে চাকরি যাইবার কোন বিধান নাই। ধর্মের খেলায় পোয়া-বার চালাইয়া তিনজনেই কিছুদিনের জন্য বড়-বড় টিকি রাখিয়াছিল ও এক-এক বৎসর ব্রাহ্মণ-সভার কল্যাণে দু-দশটাকা চাঁদা দিয়াছিল।

গোলে পড়িলেন আঞ্জুমান্-উল্-জাহান্। একালের হিন্দুদের কিছুতেই জাত যায় না ; এ-অবস্থায় বেইমান ফেরব্-বাজদের চালাকি এড়াইয়া কিরূপে বিশ্বাসীদের পবিত্রতা শতকরা পঞ্চান্ন বজায় রাখা যায়, তাহাই হইল চিন্তা ও আন্দোলনের বিষয়। এমন নিয়ম করা চলে না যে, যাহারা গোড়ায় উৎপত্তিতে হিন্দু ছিল, তাহারা মুসলমানদের অধিকার পাইবে না, কারণ তাহা হইলে আপনাদের সম্প্রদায়রূপ কম্বলখানা টেকান যায় না।

এবিষয়ে হিন্দুসমাজেও একটা তর্ক উঠিয়াছিল। সকলেই স্বীকার করিল—কোনরূপ খাদ্য-অখাদ্য খাইলেও নীলকণ্ঠ মহাদেবের পূজকদের ক্ষতি হয় না, অথবা টুপির মাথাটা পশ্চিম অঞ্চলের মেটে ঘরের ছাতের মত না রাখিয়া হিন্দুদের মন্দিরের চূড়ার মত উঁচু করিলে, কিম্বা পায়জামা পরিলে বা উল্টা দিক দিয়া জামার বোতাম আঁটিলে জাত যায় না ; কিন্তু কেদার প্রভৃতি যদি মুসলমানী বিবাহ করিত তবে জাত যাইত কি-না, এ তর্ক শুনিয়া রমণকৃষ্ণ সকলকে তালাকের আইন পড়িয়া শুনাইল। দেখা গেল—একালের হিন্দু-সমাজে দুর্বৃত্তদের দমন করা চলে না।

ছোট-বড়

হরিনাম-ই গরীয়ান্—হরি স্বয়ং উহ্য ;
পূজা-আর্চার চেয়ে হচ্চে ভোগের ভোজ্য পূজ্য ;
শোকের চাইতে বড়লোকের জন্যে জাঁকে শ্রাদ্ধ,
সে উৎসবে স্কুলের ছুটি—ওঠে খোলের বাদ্য।
বামুন থেকে পৈতা পোক্ত,—দেখ্‌তে পাবে ভাব্‌লেই ;
স্ত্রীর চেয়ে যৌতুকটি বিয়ের বেলায় lovely।
বিদ্যার চেয়ে সাধ্য কর্‌তে হয়-যে note-এর ছত্র ;
লেখার ঘটার চেয়েও পটে-ই শোভে মাসিক পত্র।
বেড়ে যাচ্ছে দৃষ্টান্ত যতই ভেবে গন্‌ছি,—
গুরুর চেয়ে চেলা শক্ত, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি।

বসন্ত

'ওগো পৃথিবী! তুমি কেমন আছ'? এ-যে বসন্তের আহ্বান। আমার আর ভাল-মন্দ কি, বসন্ত! আমি হইয়াছি একেবারে মাটি। আর দেখ—আমার চারিদিকেই গোল; আমার উত্থান-পতন শালি-গ্রামের শোয়া-বসা। তুমি যুগ-যুগান্ত ধরিয়া আমাকে বিকাশ করিতে,—অথবা আমার মধ্যে তোমাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছ। আমার অণুতে-অণুতে তোমার শিহর চমকে। কিন্তু হয় আমি অসাধ্য

রকমের ও অপরিবর্তনীয় জড় বলিয়া, আর না-হয় তুমি নিজে অক্ষম বলিয়া, আমাকে তোমা-ময় করিতে পারিতেছ না। এই-যে আমার অন্ধকার—নিবিড় ও ভীষণ, ইহাকে তোমার চোখের রশ্মির একটি সূক্ষ্ম ধারায় কখনও পরিণত করিতে পারিবে কি? আমার জমাট-বাঁধা জড়তায় পূর্ণাঙ্গ বেদনা ফুটাইতে পার না, কেবল বেদনার অতি সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ-চমকে ব্যথা জাগাইয়া তোল; আমার কুহুধ্বনিতে যাহারা আনন্দিত, তাহারা দেখে না—অই কুহুর একদিকে গভীর বেদনা, আর একদিকে অতৃপ্তির আগুনের ধোঁয়ায় রচিত হইতেছে অসমাধান-যোগ্য হেঁয়ালি। তুমি আমাতে ফুলের মত ফুটিয়া উঠিতে চাও; কিন্তু ফুল ফোটে কচিৎ, আর তোমার অসফল চেষ্টা, কাঁটা হইয়া জাগে অসংখ্য। তুমি, বুঝি, দুঃখকে পরাহত করিবার জন্যই চিরকাল ধরিয়া আমাতে তোমার বাসন্তী লীলার অভিনয় চালাইতেছ; কিন্তু তুমি কেবল জড়তায় জাগাইতেছ বেদনা,—বেদনায় জ্বালাইতেছ অবোধ্য আকাঙ্ক্ষার আগুন, আর সেই আগুনে ধোঁয়াইতেছ দুর্ভেদ্য জীবন-রহস্য। তুমি-আমি এক নয় বলিয়াই বুঝি এমন ঘটিতেছে। ফল—দুঃখ; তবুও তোমার আহ্বানে তোমাকে আলিঙ্গন করিতেছি।

বসন্তের টীকা

(প্রথম ফোঁটা)

কাল-বসন্তের টীকা চলে,—নয় বসন্ত কালের ;
তবুও দেখি কবির দল যত আছেন হালের,
গণ্‌তি করে' লেখেন্ পদ্যে কুসুম, কোকিল, বাতাস,
ইত্যাদি যাহার সংখ্যা ছাব্বিশ কি সাতাশ ;
দেখ্‌বে—এই টীকায় কেহ যদি আগুন ধরায়,
হয় না আয়েস্ ধোঁয়া পানের—নির্বাপিত ত্বরায়।

অন্ত্য যমক

(দ্বিতীয় ফোঁটা)

দাঁতের জ্বালায় লেগে গেলাম ঘরের টাকা বিলাতে ;
দাঁতুড়ে এক ধেয়ে এলেন—শিক্ষা তাঁহার বিলাতে।
বল্লেন্ কি-না—দাঁতে-দাঁতে ফিস্‌টি নিবেন্ ফুরিয়ে ;
বুঝিয়ে দিলেন—দাঁত ফুরাইলেই ব্যথা যাবে ফুরিয়ে।
শরীর গেলেই ব্যাধি যাবে,—এই তত্ত্ব চাপিয়ে,
গেলেন বৈদ্য ; আমি সদ্য সুখী হ'লাম চা-পিয়ে।
রিট্রেঞ্চি বুদ্ধি এটা,—পায় না খরচ বাড়িতে ;
বন্ধ হলে খাওয়া-পরা দেশের লোকের বাড়ীতে।

এ সরজরির কাঁথায় আগুন ! চাই না হেন ডাক্তারে ;
কাব্য-রসিক থাক্‌লে কেহ জল্‌দি করে' ডাক্ তারে।
পদ্য ছাড়া বিদ্যা যত—অতি অসার ভুষি গো।
অন্তকালের যম্-কে ভুলে অন্ত্য যমক ভূষি' গো।

উন্নতি

বিশ্বপ্রেমের তাতে ঘেমে কঠিন বটে প্রাণটা রাখা বজায়,
হিতৈষণা যতই বাড়ে, হাড়ে-হাড়ে ততই দূর্বা গজায়।

মুক্তি

না থাক্‌লে 'শং' জীবন-যাত্রায়
তত্ত্বকথা গানের মাত্রায় আসর যেত ভেঙ্গে।
আঁধারে পায় মুক্তি পেঁচা—
পাক্‌গে, তোরা হেসে চেঁচা আলোর রং-এ রেঙ্গে।

গাল-গীতা

বাক্যানন্দ পাতিহংস লিখে গেছেন গাল-গীতায়—
গেরুয়াতে ধর্ম ছাঁদা কর্ম বাঁধা লাল ফিতায়।
গেরুয়া ও লালের পরে আছে বাহার পীত সোনায়,
যাহার বশে হিতৈষীরা বিশ্বপ্রীতির গীত শোনায়।

সাধু আবিষ্কার

সবাই বলে—“এ জাতিটার সকল বেটাই মন্দ,
সবাই করে ঠকামি আর সবাই স্বার্থে অন্ধ।”
দাঁড়াচ্ছে এই—সবাই সাধু,—চোর চোট্টা নাস্তি ;
ঠগ্ বাছ্‌তে সাধুর উজাড় হবে তবে জাস্‌তি।

গূঢ়-তত্ত্ব

শঙ্করে সুধান্ সতী সন্দেহ নাশিতে,
পাট বুনে খাটে কেন বঙ্গের চাষীতে ;
কেন না জন্মায় তারা হয়ে এক জোট্—
আঙ্গুর বেদানা পেস্তা আর আখ্‌রোট্।
ভব ক’ন ভবানীকে,—“কৈলাসেতে একা
আমি জানি গূঢ় তত্ত্ব, অন্যে ভেবাচেকা ;
গুহ্য তত্ত্ব ব্যক্ত কভু করিও না ভুলে
ব্রহ্মার আজ্ঞায় মেওয়া জনমে কাবুলে।”
কপালে উঠিল চোখ শুনি বাণী ভূমা ;
হর্টিকল্‌চরের জ্ঞানে সিদ্ধবিদ্যা উমা।

শোচনা

কচি ছিলে, কাঁচা ছিলে, সে দিন থেকে তোরে,
স্নেহ ঢেলে রেখেছিলাম যত্নে মাথায় করে ;
চলে গেলে বাঁধন খুলে, ভুল হ'ল না একটি চুলে ।
খেলে যেন ভেল্‌কি বাজি লাগিয়ে দিলে তাক্ ।
হাত বুলিয়ে দেখি কি-না— সারা মাথায় টাক্ ।

কলেজি বাসায়

পরলোক ? সে মিথ্যে কথা । 'কেমন করে জান্‌লে ?'
প্রমাণের ভার তোমার উপর,—কেমন করে মান্‌লে ?
ভাগ্‌ল রমেশ (তৃতীয় সে)—মনে নাই তার খট্‌কা ;
বলে গেল—উড়া কথা যত পারিস্ চট্‌কা ।
বাড়্‌ল তর্ক—ধারা যেন নায়াগ্রার প্রপাতে ;
'জানি কত বড়লোক থিয়সফি-সভাতে ?
আস্তিক ছিলেন নিউটন, ফেরাডে ও অর্‌বিং ।
আর নাস্তিক ছিলেন স্পেন্সর, হক্স্‌লে ও ডর্‌বিন্' ।
দুপুর রাতে চেঁচায় রমেশ সিঁড়ির পথে উৎরে—
ওরে ! ঘরে ঢিল পড়্‌ছে,—পেত্নী না-হয় ভূতরে !
তার্কিকদের খাড়া তর্কের কোমর গেল মচ্‌কে ;
দোঁহে ভোরে লিখে চিঠি অলিভার লজ্‌কে ।

দাঁতের দশায়

ওরে-রে চর্বণের যন্ত্র !—ওরে আমার প্রাচীন দন্ত !
কাহার শাপে দেহ কাঁপে ? আল্‌গা কেন গোড়া ?
সাম্‌নে দেখ তাজা-তাজা—অবাক্ জলপান কড়াই ভাজা,
কড়া পাকের পেঁয়াজি আর কাঁঠাল-বিচি পোড়া।
পারনা-ক পানটি পিষ্‌তে—এনেছি তাই হামান্‌দিস্তে ;
কিন্তু লুচি দিস্তে-দিস্তে চলে না এ দাঁতে।
উড়া খই গোবিন্দে নম ; (আমি এখন ভক্ততম)
কচি শশা, পেয়ারা ডাঁসা দিচ্ছি বিশ্বনাথে।
আমার সঙ্গে দাঁতের আড়ি ;—ফুলিয়ে আর শূলিয়ে মাড়ি
আমায় শুদ্ধ যমের বাড়ী টান্‌তে চাহে না-কি ?
এত তোয়াজ—এত যত্ন—ভুলে গেলি রে কৃতঘ্ন !
ক্রিয়োজোটের ক্রিয়ার চোটে কিছুই নাই বাকি !
গজিয়ে শক্ত হওয়ার সর্তে—দিছিনু ইঁদুরের গর্তে—
ঝরে' পড়ে' গেল যখন তোদের পূর্বপুরুষ।
যাও পড়ে' যাও হে অকর্মা,—ভীত তাহে নহেন শর্মা ;
আজ থেকে প্রতিজ্ঞা তবে ক'র্‌ব না-ক বুরুষ।
দাদ্ তুল্‌ব কৃতঘ্নতার—ডাকিয়ে ডাক্তার রুদ্রাবতার ;
সাঁড়াসিতে টেনে' তুলে' ফেল্‌ব আস্তাকুঁড়ে।
কিন্‌ব নূতন মুক্তাপাতি—(নয় সে তোদের পুত্র-নাতি)
ধবলরূপে উজল্ করে' বস্‌বে পাটি জুড়ে।

প্রাচীন গেলে নূতন আসে ? সে-কি সত্য ? দীর্ঘশ্বাসে
শীর্ণ আশা কেঁপে ওঠে জীর্ণ দাঁতের মত।
যাক্ সে কথা—প্রাণে লাগে ; এই ক'টা দাঁত য'দিন থাকে
চিবিয়ে নে-রে আঁখের টিক্‌লি, পিটে-পুলি যত।

পৌরাণিক প্রশ্নোত্তর

প্র— এই কি সে বৃন্দাবন, এই কি সে মথুরা ?
কেন-বা না বাজে বাঁশী,—কোথা গোপ-বধূরা ?
উ— ঝালা-পালা কান,—তাই গেছে যথা নির্জন ;
হেথা খোলে-কর্তালে চেঁচামেচি কীর্তন।
প্র— কেন এতে ভগবান্ না হলেন্ শক্ত ?
উ— ভগবান্ থেকে ঢের বড় তাঁর ভক্ত।
প্র— ভক্তেরা—কেন শুনি, না হ'লেন্ ঠাণ্ডা ?
উ— ভক্তের চেয়ে দড় তাঁহাদের পাণ্ডা।
দশে মিলে করে গোল,—সে দশের চক্রে
একেবারে মরে' ভূত ভগবান্ অগ্রে।
হুড়ো দিয়ে ভগবানে, মূঢ়ে তা'কে অর্চে ;
এই রীতি বলবতী মন্দিরে চর্চে।

শুভ-যাত্রা

বাজারে শাঁখ, ভেরী বাজা, যাত্রাকালে শুভ যা-যা !
মন্ত্র পড় ভাট, পুরোহিত, সুরে-সুরে-সুরে।
ওরে তোরা কানা, খোঁড়া, ওরে যাদের কপাল পোড়া,
মুখ লুকিয়ে সরে' দাঁড়া দূরে-দূরে-দূরে।
হাতী ঘোড়ায় সজ্জা পরা, ছেয়ে ফেল সারা ধরা
শুঁড়ে-শুঁড়ে-শুঁড়ে আর ক্ষুরে-ক্ষুরে-ক্ষুরে।

শত্রু

পায়ের শত্রু ট্রামের গাড়ি, পেটের শত্রু জাঁক ;
মাথার শত্রু এড়ো তর্ক, কানের শত্রু ঢাক।
চোখের শত্রু সস্তা ছবি, নাকের—ধূলা-বালি ;
হাসির শত্রু জেদের গোঁ, কথার শত্রু গালি।
রূপের শত্রু অসংযম, গুণের শত্রু স্তুতি ;
সত্যের শত্রু স্বরাজ-সাধন, প্রেমের শত্রু দূতী।
ধর্মের শত্রু গুরুর বচন, কর্মের শত্রু ভান ;
নারীর শত্রু অলঙ্কার, নরের শত্রু মান।
শিশুর শত্রু নীতি-শিক্ষা, যুবার—শাসন কড়া ;
গৃহীর শত্রু টাকা ধার, বুড়ার—গীতা পড়া।
শুচির শত্রু দাস-দাসী, রুচির শত্রু খানা ;
কান্তির শত্রু সাবান-মাখা, শান্তির শত্রু মানা।

কিমাশ্চর্য্যম্

নিজে বাঁচ্‌লে বাপের নাম—এই মন্ত্র ঘনই জপি ;
ওরে চাচা, আপনা বাঁচা দারৈরপি ধনৈরপি।
জীবতি যঃ পলায়তি, নয়-ক বাক্য অবহেলার ;
ইংরেজেরাও করে স্বীকার—অইটি best part of valour.
ঘৃতপক্ক সাত্ত্বিকাহার করে' থাক মৌন ব্রতে ;
কেন-না কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ পুণ্য-পথে।
কর্ম ছুঁড়ে' ধর্ম ঢোঁড়—চক্ষু বুঁজে বন্ধ গুহায় ;
অনায়াসে পাবে শেষে মহাজনের পন্থা উহায়।
কাম্‌ড়ে ধর দন্তে তৃণ, চিত্ত কর নিত্য নরম।
তবু যদি মুক্তি না পাও, কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

এ কি ?

একি বীভৎস পূজা-উৎসব, চীৎকারে আর ক্রন্দনে !
তাণ্ডবে একি চণ্ডাল-লীলা, শান্ত শিবের বন্দনে !
শ্মশানে চিতার শিখায় আহুতি ক্ষয়ের বিভূতি বর্দ্ধিছে ;
পিশাচ-লাস্যে কামনা ধৃষ্ট, আপনা চিত্ত মর্দিছে।
সাধিয়া কাঁদিয়া ভুলায়ে ধাতায় তুষিবি রক্ত-তর্পণে ?
স্রষ্টা কি তোর শ্বসিছে স্বস্তি পিশিত-অস্থি চর্বণে ?
তুচ্ছ বিশ্বে পুরুষ মহান, ভাঙ্গিবে বিধান সাধ্য নাই।
উল্টিবে না-রে কল্‌টা ধাতার, স্বার্থের সাধা প্রার্থনায়

মাঘের একছিটে

নয় শাঁসাল, নয়-ক সরস কল্পনা যে শুঁট্‌কি গো!
কুঁচ্‌কে পড়ে নিঙ্‌ড়ে নিতে ছিটে-ফোঁটার চুট্‌কি-ও।
ভাবের খোঁজে চক্ষু বুঁজে স্বপ্নে গেলাম নন্দনেই;
শুঁকে দেখি পারিজাতের পাপড়িতে আর গন্ধ নেই।
উধাও কোথাও ইন্দ্র-সভার নৃত্যপরা সুন্দরী;
ঐরাবতের মৃত্যুশোকে মরেছে তার কুঞ্জরী।
কেশেই সারা মদন-বুড়া চ্যবনপ্রাশে কর্‌বে কি!
রতির শিরে শনের নুড়া—তাহে চূড়া গড়্‌বে কি?
কাকের ডাকে স্বপ্ন ভাগে; বল্‌লাম জেগে ধ্‌ত্তোরি!
ফেলে কাঁথা জড়াই মাথায় শীতের ভয়ে উত্তরী।
শীতের পরে বসন্তে কি শুষ্ক তরু মুঞ্জরে?
ফাল্গুনেতে দেখ্‌ব যদি কল্পনাটি গুঞ্জরে।

প্রশ্নোত্তর

(১) গোবর্দ্ধন মাষ্টার ছেলে-পড়ানো ছাড়িয়া ডাক্তারি ধরিল কেন? বেতের আঘাতে শিশুরাও মরে না,—তাই। (২) লোকে বলে চোরায় না শোনে ধর্মের কাহিনী; কেন? চোরেদের দিনের বেলায় ঘুমাইতেই হয়; রাত্রে সে কাহিনী শুনিতে বসিলে ঘুম পাওয়ার ভয় আছে। (২) লোকে বলে, উকিলের কাঁচা পয়সা; কেন? উহারা মকর্দমার ফল পাকিবার আগেই পয়সা আদায় করে বলিয়া।

(৪) চোরেরাই ডাকে-হাঁকে ; চুরি করিলে কি ডাকাত নাম পায় ? না ; তাহা হইলে-ত সাধু ও মহাজনেরা সেই নাম পাইত। (৫) ধার্মিকেরা সদা হরি-হরি বলেন কেন ? উঁহাদের কপটতা নাই— যাহা করেন, তাহাই বলেন। (৬) গুরুজনদের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে হয় কেন ? সকল সময় বয়স্কদের ঘাড় পর্য্যন্ত হাত পৌঁছায় না বলিয়া। (৭) ছিদাম বাবু বলেন, তাঁহার মরিবার অবসর নাই ; কেন ? পূরামাত্রায় তাঁহার শ্রাদ্ধের টাকা জমে নাই বলিয়া। (৮) পাড়াগাঁয়ের লোকেরা বলে, লক্ষ্মী-সরস্বতীকে বিসর্জন দিতে নাই ; কলিকাতায় সরস্বতী বিসর্জন দেয় কেন ? লক্ষ্মী ত নিজেই ডুবিয়া মরিয়াছেন, এখন সরস্বতী বিসর্জন দিলেই আপদ চোকে বলিয়া।

অতিবুদ্ধি

একি তুমি কল্লে হরি,—সৃষ্টির মুচ্ছুদ্দি !
আমায় কেন দিলে ঠাকুর, অতি বেশি বুদ্ধি ?
কোঁচা দিতে ফুরায় কাপড় ; তখন কাছার জন্যে
বুদ্ধি করে' দড়ি বাঁধি,—বোকা বলে অন্যে।
বিনা শিক্ষায় বিদ্যে বাড়ে,—তত্ত্ব গড়ি সূক্ষ্ম ;
হাঁদায় আমায় বলে গাধা ? বিশ্বে সবাই মূর্খ।
বোকা নেপো মারে দই, আমি মরি দৈন্যে ;
দাওগো বুদ্ধি কেটে-ছেঁটে, নইলে হব হন্যে।

সাহসী কেরানি

কেরানিরা আপিসেতে বিচার কর্‌ছে ঝিমিয়ে,—
কি উপায়ে ভজরাম গেল সবায় ডিঙ্গিয়ে ;
একজন বল্‌লে—বিচার করি আর কতবা,
এটা সুপারিশের জোরে—খোসামোদে অথবা ;
আড়াল থেকে ভজরাম শুনে এল সম্মুখে ;
বল্‌লে দর্পে ঃ "বাজে কথা বলছ সবাই কোন্‌-মুখে ?
ধার ধারি না খোসামোদের, করি না বশ নজরে,
চাক্‌রি পেলাম কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে সজোরে ;
বল্‌লাম—'সাহেব ! অতি মূর্খ না হয় আমি হলাম্‌ই,
কিন্তু মোরা তিনটি পুরুষ কর্‌ছি তোমার গোলামি ;
ঘাড়েতে বই তোমার জুতা, দাঁতে খুলি ফিতে গো,
তবুও না ওঠে মন আমায় চাক্‌রি দিতে গো ?'
শুনেই সাহেব হতভম্ব ; চুকে গেল লেঠা হে,
গরমা-গরম বলতে পারি, আমি বাপের বেটা হে।"

চোখে-দেখা ঘটনা

দৈবে একদিন আমার জ্ঞানের নাড়ী হইল টন্‌টনে। বুঝিলাম মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার করা মায়ার ছলনা ; সন্তানাদি পোষা মোহের বিড়ম্বনা, আর "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।" শ্রেয়ের

পথে বিঘ্ন অনেক। একজন যাঁহাকে বন্ধু বলিতাম, তিনি বুঝাইতে বসিলেন—দশজনে রোজগার করে বলিয়াই সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা পায়; কাজেই রোজগার করাই পন্থা, আর ভিক্ষা নেওয়ার অর্থ—চুরি ডাকাতি করা। এ কথাও বলিলেন—যোগীরা সাপ-বাঘ দমন করিয়া বনবাস করিতে পারেন, তবে একালে সরকারি বনে-পাহাড়ে বাসা বাঁধিতে গেলে হয় টেক্স দিতে হইবে আর না হয় স্বচ্ছন্দ-বনজাত শাক-সব্জী, ফলমূল কুড়াইলে জেলে যাইতে হইবে। বন্ধুটির কণ্ঠে বসিয়াছিল দুষ্ট সরস্বতী; আমি কাহারও কোন কথা না মানিয়া যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে গেলাম।

কলিকাতা শহরের জনতা এড়াইয়া চলিতেছি, এমন সময়ে একজন চট্ করিয়া আমার হাত ধরিয়া আমি 'ভাল আছি কি না' জিজ্ঞাসা করিলেন। কখনও তাঁহাকে দেখিয়াছি, মনে হইল না। তিনি আমাকে বিস্মিত দেখিয়া হাসিয়া আমাকে একটি ঘরের মধ্যে নিয়া গেলেন, আর আমাকে তাঁহার পরিচয় দিবেন বলিয়া একখানি আসনে বসাইলেন। তাহার পর না-জানি কতদিনে কত-কি ঘটিয়াছিল! একদিন তিনি আমাকে বলিলেন—"তোমার জ্ঞান অনেক হইয়াছে; সময়ের বোধ প্রায় উড়িয়া গিয়াছে ও অল্প একটুখানি আছে, তবে আকাশের বোধ উড়িয়া যাইবার মত অবস্থা হয় নাই।" তিনি এই বলিয়া হাওয়ায় মিলিয়া গেলেন; তাঁহার সেই ঘরখানিও হাওয়ায় মিলিয়া গেল। আমি তাকাইয়া দেখিলাম—চারিদিকে কোন জন-প্রাণী নাই। কলিকাতা শহরের বাড়ী-ঘর, রাস্তা কিছুই নাই,—আছে কেবল চারিদিকে বিশাল বিস্তীর্ণ মাঠ, আর সেই মাঠে আছে নানা শস্যের ক্ষেত ও নানা ফলের বাগান। ভাবিতেছিলাম, আমি বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছি। জোরে নিজের গায়ে চিম্‌টি কাটিলাম, ব্যথা লাগিল।

সহসা আমার মাথার উপরে একখানা উড়ো-জাহাজ আসিয়া ঝুলিতে লাগিল, আর সেই জাহাজ শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিয়া কয়েকজন মানুষ আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আমি তখন তাহাদের ভাষা বুঝিতে পারি নাই, তবে অল্প পরেই আমি তাহাদের ভাষা শিখিয়াছিলাম ও তাহারা আমার ভাষা শিখিয়াছিল। তাহারা সেদিন আমাকে দেখিয়া বিস্ময়ে ভাবিতেছিল—আমি কোথাকার মানুষ। আমাকে সেই উড়ো-জাহাজে চড়াইয়া গঙ্গার মোহনায় সমুদ্রের অনেক জাহাজের মধ্যে একখানি বড় জাহাজে নিয়া রাখিল। বৈজ্ঞানিকেরা আমার শরীর পরীক্ষা করিয়া স্থির করিল যে তখন আমার বয়স হইয়াছে চার হাজার তিন শত একাত্তর বৎসর ও কয়েক মাস। আমার মুখে তাহাদের অতীত যুগের ইতিহাস শুনিবার জন্য প্রতিদিন সভা বসিত, আর আমিও সেই জাহাজে বসিয়া উহাদের প্রত্নতত্ত্বের সিদ্ধান্ত পড়িতাম।

আমি যে জাহাজে ছিলাম সেখানা মিউজিয়ম জাহাজ, কারণ আমিও ছিলাম মিউজিয়মে রক্ষিত মানুষ। একখানি বইয়ে আমাদের সেকালের বিবরণ পড়িলাম। লেখা আছে—আমাদের চার হাজার বছর আগেকার যুগের মানুষেরা ছিল এমন বর্বর যে, চাষের ও বাগানের ভূমির বহু অংশ মানুষের আবাস গড়িয়া নষ্ট করিত, আর গাছের ডালের আগায় বসিয়া গোড়া কাটিবার মত বুদ্ধিতে যথেষ্ট শস্যের জমি না পাইয়া দুর্ভিক্ষে হাহাকার করিয়া মরিত। বর্বরদের জানা ছিল—স্থলের ভাগ অপেক্ষা অপেয় লোনা জলের ভাগ ছিল তিনগুণ অধিক ; তবে সাগরের ঢেউ ও ঝড়-ঝাপ্টা দমন করিবার বুদ্ধি ছিল না বলিয়া ডাঙ্গায় বাস করিত ও নানা রোগে ভুগিয়া মরিত। বর্বরেরা জানিত না—কি করিয়া অফুরন্ত খাদ্য সংগ্রহ করা যায়, তাই যাহাতে লোকসংখ্যা না বাড়ে তাহার জন্য কৃত্রিম উপায় সৃষ্টি করিয়া নানারূপে আপনাদের

চরিত্রহীনতা ঘটাইত। অবোধ্য রকমের একটা ভেদ-বুদ্ধি সৃষ্টি করিয়া মানুষে-মানুষে যুদ্ধ করিয়া লোকক্ষয় করিত, আর সকলের সহযোগিতায় একযোগে বাড়িয়া শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধিতে পারিত না।

অন্য একখানি বইয়ে এরূপ পড়িলাম—প্রত্নতত্ত্বের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে ধরা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের লোকেরা এক সময়ে ইউরোপের ইংলণ্ড দেশটি ও প্রায় সারা উত্তর আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দ্বীপ ও আফ্রিকার অনেক অংশ জয় করিয়াছিল। উহার প্রমাণ এই—প্রাচীন অনেক লিপি পড়িয়া মনে হইয়াছে যে নিজেদের আটপৌরে ভাষা ছাড়া ভারতবর্ষে এমন একটা পোষাকি ভাষা ছিল যাহা রাজ-কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, আর ঠিক সেই ভাষা এখন ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতিতে চলিত আছে। ইহাও সকল অবস্থা দেখিয়া অনুমিত হয় যে, ইংলণ্ডের লোকেরা ভারতবাসীদের দাস ছিল বলিয়া তাহারা অনেক ব্যয়ে জাহাজে চড়িয়া ভারতে আসিয়া অস্ত্র-শস্ত্র ধরিয়া এই দেশকে রক্ষা করিত, আপনাদের দেশ হইতে কাপড় বুনিয়া ও নানা সামগ্রি তৈরি করিয়া ভারতে পাঠাইত; আর অনেকে Indian Civil Service অর্থাৎ ভারতীয় চাক্‌রির উপযোগিতার পরীক্ষা দিয়া ভারতের চাকর হইয়া কাজ করিত, অর্থাৎ অনেক বিষয়ে বর্বর হইলেও ভারতবর্ষের লোকের স্বাধীনতা ছিল অতিশয় পাকা ও প্রভাব ছিল পৃথিবীর অনেক দেশ জোড়া।

আমি এই বিবরণ পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলাম ও আমাদের যুগের অনেক প্রত্নতত্ত্বের অসারতার কথা ভাবিতে লাগিলাম। একটা আর্য্য ভাষার নমুনা নানা দেশে পাইয়া সকল দেশের সকল জাতি ককেসস্ প্রদেশে জন্মিয়াছিল বলিয়া চারি হাজার বৎসর আগে যাহা ভাবা গিয়াছিল তাহা এ-যুগের এদেশের ইংলণ্ড-জয়ের বিবরণের

মতই অসার ছিল। আমি একদিন এই অদ্ভুত প্রত্নতত্ত্বের বিরুদ্ধে নিজের ব্যক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানের প্রমাণ দিতে বসিলাম, কিন্তু তত্ত্ববিদেরা আমার দেওয়া ইতিহাস খাতিরে আনিলেন না। এত অধিবাসীর এত বড় ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের মত ছোট দেশ অধিকারে আনিয়াছিল, তাহা ভাবিতে পারিলেন না; ভাবিলেন, চার হাজার বছরের বুড়ার মস্তিষ্কের দুর্বলতা ঘটিয়াছে। আমি মনে মনে বলিলাম—তথাস্তু; একবার পাকা বুড়া বয়সে কল্পনা করিয়াও সুখী হই—আমরা ছিলাম জেতা আর অন্যেরা ছিল বিজিত।

আর একদিন ইংরেজের অধীনতার প্রমাণ পাইলাম এই নূতন যুগের ভাষাতত্ত্বের এক অধ্যায়ে। বৃটিশ শব্দের উৎপত্তি না-কি ভারতীয় বৃত্তীশ শব্দ হইতে; অর্থাৎ যাহারা ভারতের সেবা ও চাক্‌রি প্রভৃতি বৃত্তি অবলম্বনে ঈশ বা শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহারা হইয়াছিল বৃটিশ। পশ্চিম উপকূলের কানাড়া অঞ্চলের সৈন্যেরা প্রথমে উত্তর আমেরিকা জয় করিয়াছিল বলিয়া না-কি আমেরিকার উত্তরভাগের নাম কানাডা। ইংরেজেরা না কি ভারতের অধীনের ছোট বা কুৎসিত রাজাকে বলিত কিং; কেন-না কিম্পুরুষ মানে কুৎসিত পুরুষ বা বনমানুষ, আর কিঙ্কর মানে নীচ কর্মচারী বা ভৃত্য। নানা শব্দের এইরূপ নিরুক্তি পড়িয়া বুঝিলাম, যেখানে সগর রাজার পিণ্ডের ব্যবস্থায় সমুদ্রের নাম হইয়াছিল সাগর, ঠিক সেইখানেই মোক্ষমুলর, ব্রুগ্‌মন্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতদের জন্য পিণ্ডি চটকান হইতেছে।

একদিন নূতন যুগের লোকেদের কাছে প্রাচীন বর্বর যুগের জন্মান্তর বিশ্বাসের বিবরণ শুনাইয়া বলিলাম--সেকালে এক সময়ে বিশ্বের ক্রমবিকাশ ও মানসিক উন্নতির পর উন্নতি স্বীকৃত হইত না, আর বর্বরদের বিশ্বাস ছিল যে, এক যুগের পর প্রলয় ঘটিয়া নূতন আর

এক যুগের জন্ম হইত, আর সেই প্রলয়ের ফলে এক সময়ের লুপ্ত যুগ আবার দেখা দিত ও খানিকটা দূর উন্নতির পর আবার প্রলয় আসিত। প্রলয়ের সময়ে এমন অনেক মহাপুরুষের পুনর্জন্ম হইত যাঁহারা থাকিতেন জাতিস্মর; অর্থাৎ অই যে প্রলয়ের পর প্রলয় ঘটিল ও জন্মের পর ঘুরিয়া-ঘুরিয়া জন্ম হইল, তাহা মহাপুরুষের স্মৃতিতে জাগিয়া থাকিত; কথাটি শুনিয়া সকলে হো-হো করিয়া হাসিল, আমিও হাসিলাম।

আমাদের হাসি ফুরাইতে-না-ফুরাইতে আকাশে ঘনঘটা করিয়া মেঘ উঠিল; প্রবল ঝড়ের বাতাস বহিল, অর্থাৎ মহাপ্রলয় দেখা দিল। অতি অল্প সময়েই পরিপুষ্ট জ্ঞানের উন্নতি সগর রাজার আবাসে বা বিষ্ণুর শয়নকক্ষে ডুবিয়া গেল। আবার নূতন সৃষ্টি হইল ও বহু যুগের বিকাশের পর আমার সেই বৈরাগ্য-বুদ্ধির দিনের সভ্যতা ফিরিয়া আসিল। আমি বহু যুগের বহু জন্মের পথ দিয়া জাতিস্মর হইয়া কলিকাতা শহরে বাড়িয়া উঠিলাম। বহু লক্ষবারের নবজন্মে জাগরিত কলিকাতায় বসিয়া সকল শ্রেণীর সংস্কারের চেষ্টা ও রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতির অসারতা দেখিয়া হাসিলাম ও লোক-শিক্ষার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিলাম।

ভক্তের অভক্তি

বর্ণে বর্ণে কালা ঠাকুর, বসিয়ে মোরে দাঁড়ে,
হাত বুলিয়ে ঘাড়ে,
পড়িয়ে যাচ্ছেন অবিরাম "পড়-বাবা আত্মারাম,"
বিদ্যা ত না বাড়ে।
তিনি আমার সত্তাটুকু আমসত্বের মত,
(যত্ন নিয়ে কত)
শুকিয়ে রাখ্‌বেন্ পরিপাটি—ছাড়িয়ে খোসা ফেলে আঁটি
রইব কি অক্ষত ?
ঘুরিয়ে টেকোয়, পাকিয়ে মোরে সূতারূপে ঠাকুর
কাজটি চালান্ মাকুর।
আমি টানা, আমি পোড়েন্, খদ্দরে মোর স্বরাজ গড়েন ;
ব্রহ্মা বলেন "আঁকুর"।
কালা-গো, তোল্‌না কানে, যতই ডাক ছাড়ি,
চেঁচিয়ে ছিঁড়ে নাড়ী ;
দল পাকিয়ে তবু লোকে তোমার দোরে মাথা ঠোকে
আমি কচ্ছি আড়ি।

গবেষণা

পণ্ডিতজি বলিলেন—ওহে বাবুজি, ইংরেজি Mill কথাটা সংস্কৃত থেকে নেওয়া ; আমাদের সেকালে আগুনের শক্তিতে মীল চালাইবার ব্যবস্থা ছিল, আর সে মীল চালাইতেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা। প্রমাণ—"অগ্নিমীলে পুরোহিতং"। বাবুজি উত্তরে বলিলেন—কিন্তু দেখুন পণ্ডিতজি, সেকালে মেঘ-বর্ষায় মাথা বাঁচাইবার ছাতা ছিল না ; আর মাঘের শীতে শরীররক্ষার শীতবস্ত্র ছিল না ; তাই লোকে দীর্ঘকাল বাঁচিত না। প্রমাণ—"মেঘে মাঘে গতং বয়ঃ।"

মহালয়া

লীগের হাতে তিলোদক, মুখে মন্ত্র—তৃপ্যতাং,
আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত জগৎ তাহে চিৎপটাং।
ব্রিটন কহেন সবিস্ময়ে "ওহে লীগ্ বলীয়ান!
একি অশাস্ত্রীয় কাণ্ড, জ্যান্তে জলাঞ্জলি দান!
শান্তি সন্ধির গায়ে জল দিলে তুমি চটপটাং,
দুর্বলেরা ইহার ফলে ভূমিতলে ছটফটান্।
ফরাসীরা Ruhrএর শিরা শুষে করে রক্তপান।
অষ্টিরিয়ায় হিষ্টিরিয়া তবু আছে শক্ত প্রাণ।
মুসোলিনির মুসলখানি গ্রীসের নাশে বর্দ্ধমান
তর্পণেতে ব্যস্ত মিছে কর্তা তুমি বর্তমান।"

কহেন কর্তা "তর্পণেতে হবে সর্ব সমাধান—
গয়া-গঙ্গা-গদাধর সবায় দেবে সমান টান।
কালের ঘড়ি চল্‌বে সটাং যতই কর তুলকেলাম্ ;
অটল দোলে চল্‌বে দুলে দুঃখসুখের পেণ্ডুলাম্"।

*　　*　　*　　*

জাতি-উপমা

হিতৈষণা এসে যখন বুকে কশে' ঘা মারে,
(শক্ত হাতে তপ্ত লোহা পেটে যেন কামারে)
চাঁচি প্রাচীন ভাবের বাগান নব রাজ্য স্থাপিতে,—
চামড়া সহ চাঁচে দাড়ি যথা খোট্টা নাপিতে।
মাতিয়ে দিতে অন্য লোকে বক্তৃতাদি জুড়ি গো ;
মাতিনা-ক নিজে ; যথা খাঁটি থাকে শুঁড়ি গো।
ধেয়ে যদি আসে পাগ্‌ড়ি আমায় দূরে ঠেলিতে,
হাত পিছ্‌লে পালিয়ে যাই, পালায় যথা তেলীতে।
পোষাক দেখে চিন্‌বে ভেবে বদ্‌লে ফেলি শোভা গো,—
উল্টে পরি পরের কোট, পরে যথা ধোবা গো।

যাত্রায় গোল

মানুষেরা ফানুস্ গড়ে' যায় উড়ে কেউ আকাশে,
কেউ ডুবুরি-নায়ে চড়ে' যায় পাতালের আবাসে ;
অর্থাৎ কিনা ধূলা-ভরা ধরাখানা এড়িয়ে,
অজানা সব দূরের মুলুক ওট্‌কাতে চায় বেড়িয়ে।
'অজানা' কয় সম্ভাষিয়ে ধরাবাসী দুঃখিতে—
তৈরি আছে তোদের বাসা আমার গোপন কুক্ষিতে।
শিউরে সবাই উঠল শুনে', জাগ্‌ল বিষম ভাবনা ;
কাম্‌ড়ে ধরে' ভিটের মাটি সবাই বলে—যাব না !
যেতেই হবে বাছাধন নয় তরী বা ফানুষে,
ব্যস্ত হয়ে স্বস্ত্যয়নে লেগে গেল মানুষে।

আনন্দ

অচিন কথার উপমাতে তোমায় বুঝি ভাল,
রূপে, তুমি তপস্বিনী, উমার মুখের আলো।
রসে, তুমি শচীর ভোগের ফলের মত মিঠে ;
স্পর্শে, সীতার করুণ চোখের স্নিগ্ধ জলের ছিটে।
গন্ধে, রমার গলার মালার ফুলের কলির হাওয়া ;
শব্দে বাণীর গীতি-প্রীতির ঢেউ-এর তালে গাওয়া।

বিধাতার ঝক্‌মারি

বল্‌লেন্ হরি ওরে মানুষ, দিলাম্ মস্ত পৃথিবী,
বল্‌না শুনি, প্রতিদানে তোরা আমায় কি দিবি ?
কুড়িয়ে নিয়ে রত্নশস্য হাস্যমুখে দুহাতে,
মানুষ কহে—ওহে-ঠাকুর কুলায় না যে উহাতে ;
বিনাশ্রমে সুখ দাও চালা ফুঁড়ে ছড়িয়ে।
হরি ভাবেন—কি ঝক্‌মারি কর্‌লাম মানুষ গড়িয়ে !

—০—

পাজি

সুখের বোঝা বইতে গেলেও মচ্‌কে লোকের ঘাড়,
কটাস্ করে হাড়।
মানুষ তখন কেঁদে বলে—দুঃখ দিয়ে ধাতা,
ভাঙ্গ কেন মাথা ?
এরই নাম যদি সুখ, তবে ইনি ভাগুন,—
সুখের কাঁথায় আগুন !
ধাতা ভাবেন—মানুষগুলোর আন্দোলনই নেশা,
চেঁচিয়ে মরাই পেশা।

কহে শয়তান—লুচির ময়দা দিতে কেন ধাতা,
বুকে ঘোরাও যাঁতা ?
ধাতা কহেন—আদৎ মানে বুঝিস্ না তুই ঠেঁটা,
ঘোঁটে বাড়াস্ লেঠা।
কহে শয়তান—বোঝাও দেখি,—এই রাখ্‌ছি বাজি !
ঠাকুর কহেন্—পাজি !

—০—

অভিসার

রাধা— ফুটিল কি পায় সই যায় না যে হাঁটা গো।
সখি— কবিতার বঞ্জুল, খাঁটি বেত-কাঁটা গো।
রাধা— গুন্‌গুন্ গান গায়, এল বুঝি শ্যামরায়।
সখি— গুঞ্জরে এ-যে মশা, বাপ্‌রে কি কাম্‌ড়ায় !
রাধা— অবিচারে অভিসারে ঘুরি কি-বা বাতিকে ?
সখি— কালার বদলে পাবে কালা-জ্বর, রাধিকে !

—

হাসি ও কান্না

রক্ত ছিল তপ্ত বেশি, মাংসপেশী টন্‌টনে ;
চিন্তাহীন চিত্তভূমি শুক্‌না ডাঙ্গা ঠন্‌ঠনে।
পল্‌কা-ভাব-স্পর্শ-লাগা হাল্‌কা স্নায়ু-কম্পনে—
খেল্‌ত ছুটে টাট্‌কা প্রাণ, মট্‌কা-ছোঁয়া লম্ফনে।
বর্ষভরা থাক্‌ত বায়ু, সিক্ত যেন চন্দনে ;
বন্‌-বাদাড়ে নিত্য সুখী, ইন্দ্র যেন নন্দনে।
ফুট্‌ত মিছে উচ্চ হাসি তুচ্ছ কথা জল্পনে ;
শূন্যভূমি পূর্ণ হ'ত উর্ণা-রচা কল্পনে।

উল্টাবাগে মুখ ফিরিয়ে থাক্‌বি কেন তন্মনে ?
ঋদ্ধিভরা বৃদ্ধ সুখে বিশ্বে নূতন জন্ম নে।
বইলে পরে হাত কাঁপিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া কন্‌কনে ;
বিশ্বপ্রীতি ঘষ্‌বি দেহে জ্বাল্‌বি আগুন গন্‌গনে।
থাক্‌না যুবা মগ্ন মোহে অঙ্গনাদের অঙ্গনে ;
যৌনগর্ব খর্ব করে' সর্বজনের সঙ্গ নে।
হোক্‌গে ভস্ম অট্টহাস্য দুঃখ-শোকের স্পন্দনে ;—
তৃপ্তি বেশি হাসির চেয়ে পরের তরে ক্রন্দনে।

উদ্দেশ্য

ফুরায় না সে অরূপ-কথা, মুড়ায় না সে ন'টের গাছ ;
সমানে তার বয়স কাঁচা, সেই পুরাতন খেলার কাজ।
কাজের ফাঁকে ছিটে-ফোঁটা জিরেন্ কাটের রসের ধার ;
হাঁড়ি-ভরা নয় সে তাড়ি, মত্তজনের পিপাসার।
নয় নবেলের রোমাঞ্চ বা দার্শনিকের তত্ত্ব-ফল ;
ঠোঁটের বোঁটায় একটু হাসি, চোখের কোঠায় একটু জল।
হয় সে মিষ্ট, না-হয় তিক্ত, না-হয়ত বা একটু ঝাল—
ছিটে-ফোঁটা বইত সে নয় ! কেউ না তাহে দিও গাল।

মনোহর

আমার ক্ষুদ্রতার হীনতায় তোমার জন্ম, হে মনোহর ! আর তুমি আমার হীনতার ক্ষোভ ও দীনতার ক্লেশ ঘুচাইয়া আমাকে অনন্যমনা কর ও মুগ্ধ কর। এই যে দৃষ্টি কৌতূহলের উদ্বেগে অফুরন্ত দূরে প্রসারিত হইতে গিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহার অবাধগতি রুধিয়া, উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ নীলবর্ণে আকাশের আবরণ রচিয়া তুমি প্রকাশিত হও, হে নয়নরঞ্জন ! আর আমি তোমার ধ্যানে তোমার মোহে অসীমের আকাঙ্ক্ষাটুকু ভুলিয়া যাই। মানুষের প্রাণের তলায়—তাহার কর্মের উদ্দেশ্যের তলায়, তাহার গতির জননাস্পদের তলায় আমার জিজ্ঞাসায়

চঞ্চল বুদ্ধিকে ডুবুরি সাজাইয়া নামাইতে চাই, কিন্তু ঘাটে, কূলের লহরী-লীলার উপর তোমাকে পাইয়া সেইখানেই সে সাঁতার ঘাটে। প্রেমের শৈত্যে ও হাসি-কান্নার দৌত্যে আমি তোমাকে জড়াইয়া ধরি, হে মনোহর! তাই অবগাহনে বিস্মৃতি ঘটে। মনোহর! তুমি কি দার্শনিকের ব্যাখ্যার সেই সৃষ্টির মায়া?

যে চিত্র ফুল্লতায় উদ্ভাসিত, আলোকে অনুরঞ্জিত, মহিমায় মহৎ, তাহা যখন অনুভবের অতীত লোকে লুকায়, আর নিবিড় অন্ধকার অতি মসৃণ স্পর্শ বহিয়া আমাকে অধিকার করে ও আমার চেতনা নিস্তরঙ্গ সাগরের তলায় বিজনতার মূক সম্ভাষণে স্তম্ভিত হয়, তখন তুমি—হে মনোহর, অন্ধকারের অভেদ্য গুহায় মসৃণতার আস্তরণে বসিয়া আমাকে স্পর্শ কর ও আমি সেই স্পর্শে উজ্জ্বল চিত্রের স্মৃতি ভুলিয়া তোমাকে সারা অঙ্গে জড়াইয়া ধরি। স্মৃতির রাজ্যের—স্বপ্ন-রাজ্যের আলোকের ঢেউ ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে মিলাইয়া যায়।

হে বিনোদ, তুমি কামনার উদ্বেগে, চিন্তার চঞ্চলতায়, কৌতূহলের গতিতে, নিষ্ফলতার নিশ্বাস-প্রবাহে আমার হীনতা ও দীনতা হইতে ক্ষরিত সূক্ষ্ম সত্তায় জাগিয়া ওঠ, ও শেষে সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া আমার অনুভূতির ও ভোগের একমাত্র সম্পদ হইয়া দাঁড়াও। তুমি জীবনে আমার সহচর; মরণেও কি অনুচর হইবে? এস মনোহর, আমি তোমার অবিচ্ছিন্ন প্রসারের মধ্যে আমাকে হারাইয়া ফেলি।

সাগর

আমি সাগর। আমার বুকের উপরে একদিকে আনন্দের উত্তাল তরঙ্গ, আর অন্যদিকে বিষাদের জড়িমা ও নিশ্চেষ্টতা। জনপূর্ণ মহাদেশের কূলে-কূলে আমি নিরন্তর আছড়াইয়া পড়িতেছি; আর যেখানে মেরুপ্রান্তে মাথার উপরে অবিরাম প্রবল ঝঞ্ঝা বহিতেছে, সেখানে চিরজাগ্রত শীতলস্পর্শে আমার উচ্ছ্বাসগুলি স্তরে-স্তরে পাহাড় সাজাইয়া নিশ্চল হইতেছে। পৃথিবীর কূলের আঘাতজনিত ব্যথাই আমার আনন্দ; আর চিরশীতল স্পর্শে জাত নির্মল শুভ্র কঠোরতাই আমার নির্বাণ। আমার মোক্ষ—আমার গতি, একদিকে চঞ্চলতার অবিরাম উচ্ছ্বাসে, আর একদিকে ঝঞ্ঝার তলায়—নিশ্চল সমাধিতে।

ছায়া

আমি ছায়া। আমার পিছনে পিছনে রহিয়াছে এক অত্যাজ্য অনুচর; সে বৃহত্তর ও গাঢ়তর ছায়া—সে মৃত্যু। আমার সম্মুখের পা ফেলিবার পথে রহিয়াছে উজ্জ্বল ও অফুরন্ত শূন্য। আমি এক-একবার অলস হইয়া বৃহত্তর ছায়ার গায়ে ঢলিয়া পড়ি, আর এক-একবার কর্মবীর হইয়া শূন্যে পাদক্ষেপ করি। উভয় দিকেই ভীতি। অন্ধকারের মোহে ও আলোকের উত্তেজনায় আমি আমাকে মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া ভাবি ও নির্ভয় হইয়াছি ভাবিয়া শান্তির মন্ত্র পড়ি। লোকে বলে আমি আলোকের সহচর; কিন্তু বুঝিলাম না—আমার প্রতিষ্ঠা অন্ধকারে, না, আলোকে—মৃত্যুতে, না, জীবনে? আমার সম্মুখে পথের চির-উজ্জ্বল শূন্যের ভিত্তি কোথায়? আমার ভিত্তি কোথায়?

পৃথিবী

আমি পৃথিবী। হে সূর্য্য! জন্মের মুহূর্ত হইতে আমি তোমাকে বেড়িয়া বেড়িয়া ঘুরিতেছি; যে আমাকে বেড়িয়া ঘোরে, তাহাকেও বুকে ধরিতে পারিলাম না,—তোমাকেও নয়। হে সূর্য্য! তুমি নিজে আমাদিগকে টানিতে টানিতে বহুদূরের "লীরা"-কে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছ। সেই তোমার সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছ, অথচ সেপথে দু-এক তিল বই অগ্রসর হইতে পার নাই; আর তুমি যদি বহুদূরেও অগ্রসর হইতে, তবে কি এখনও লীরায় ও তোমাতে সমান ব্যবধানই রহিত না? তুমিও লীরাকে পাইতেছ না, আমিও তোমাকে পাইতেছি না। মিলন নাই, মৃত্যু বা নির্বাণ নাই,—কেবল আছে অনন্ত পথে অনন্ত বেষ্টন।

মানুষ

আমি ঊর্দ্ধে—অতি ঊর্দ্ধে উড়িতে শিখিয়াছি,—আমি ঊর্দ্ধতম পর্ব্বতের শিখরে উঠিতেছি, আমি আত্মদম্ভে ঊর্দ্ধকে জয় করিতে চলি নাই। আমার ক্ষমতার সীমায় দাঁড়াইয়া এই আমার আবাস-স্থলের অজানা প্রান্তে নূতন রাজ্য দেখিতেছি। আমার জ্ঞানের উচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া তাহাদের প্রাণের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িয়াছে—যাহারা একদিন আমার অজ্ঞানে ও ঔদাসীন্যে অপরিচিত অথবা উপেক্ষিত ছিল। হে অজানা আপনার জন! আমি তোমাদিগকে দেখিব,—তোমাদিগকে ধরিব, আর তোমাদের সৌন্দর্য্যের ধ্যানে আমার চারিদিকের শূন্যকে পূর্ণ করিব।

ঘুঘু

সঙ্গীতশাস্ত্রের নির্দেশে যে সময়ে গান গাইতে নাই, সেই তপ্ত মধ্যাহ্নে গাছের পাতার আড়াল হইতে ঘুঘুর ডাক শুনিয়াছ? কি মধুর, কি স্নিগ্ধ! ঘুঘুর ডাকে দুঃখের ছায়া কাঁপে? প্রাণ করুণায় ভরে? উহাই কি মধুর নয়? হে ভীরু, হে স্বার্থপর, তুমি করুণায় কোমল হইতে চাও না; তাই বুঝি ঘুঘুকে করিয়াছ অমঙ্গলের পাখী, আর উহাকে ভিটায় চরিতে দেখিলে আঁৎকাইয়া ওঠ। তুমি শুনিতে চাও কোকিলের কুহু, সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষার জ্বালাভরা ও চড়া পর্দায় সাধা উদ্বেগের ধ্বনি। মধুমাধব গিয়াছে, শুক্র গিয়াছে; এখন শুচি,—এখন আষাঢ়; এই শুচি-স্নিগ্ধ আষাঢ়ে তোমার কোকিল নীরব; তুমি ভীরুতা ছাড়িয়া, মেঘের ছায়াপাতে মনোহর—সতেজ সবুজ পাতার কুঞ্জতলে বসিয়া শোন—ঘু-ঘু-ঘু।

সুন্দর

তুমি কিসের মত সুন্দর, কাহার মত সুন্দর, তুমি মনকে অধিকার করিয়াছ, তবুও তোমাকে উপমায় বুঝিতে চাই, কেননা আমার সারা জ্ঞানের জন্ম পূর্ব পরিচয়ের ঘরে; আমার পূর্বপরিচিত ও সঞ্চিত শোভার সামগ্রিগুলি তোমার প্রভাবের আওতায় আনিয়া নৈবেদ্যের মত সাজাই, আর তোমাকে তুলনার বিন্দুতে-বিন্দুতে জড়াইয়া আমার আকাঙ্ক্ষার মণ্ডপ সাজাই। আমার সকল পূর্ব-পরিচিত সামগ্রি দুঃখের নিশ্বাসে ও আনন্দের উচ্ছ্বাসে অচ্ছেদ্য মিশ্রণে গড়া। আনন্দের জড়তা ভাঙ্গিয়া দুঃখ যে অশেষ চেতনা আনে,

সেই চেতনা তোমার প্রকাশকে অফুরন্ত করে। তুমি সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা ?

শ্রাবণের ধারা বহিতেছে, তাহার ঝম্‌ঝম্ রব আমাকে সীমার মধ্যে—ক্ষুদ্রের মধ্যে ডুবাইতে চাহিতেছে। জলাশয়ের আকাঙ্ক্ষা কণ্ঠায়-কণ্ঠায় পূরিয়াছে; আমার আকাঙ্ক্ষা কণ্ঠায়-কণ্ঠায় পূরাইও না! আমার সলিলটুকু নিয়াই যত উচ্ছ্বাস ও তরঙ্গলীলা। এই শূন্যের মাঝেই আমার ব্যগ্রতার ঝড় বহিয়া যায়, আর আমি উগ্র বেদনায় টলিতে টলিতে সীমার কিনারা ভাঙ্গিয়া আছ্‌ড়াইয়া পড়িয়া অজানা অকূলে ও স্বপ্নে ভাস্বর হই।

অন্ধকার যেখানে অবকাশহীন ও নিরবচ্ছিন্ন, সেখানকার শব্দমুখর অনুভূতি কোন্ দেশের আঘাত পাইয়া প্রতিধ্বনি তোলে? তাহাতে না আছে করুণার কোমলতা, না আছে কঠোরের কর্কশতা; সে ভীতি-জড়িত মোহ,—সে চিত্ত-বিজয়ী আহ্বান। প্রতিধ্বনি ফুরায় না। একি নিরবধি গতির ঘর্ঘর?

বুদ্‌বুদ

তুমিও বুদ্‌বুদ, আমিও বুদ্‌বুদ, তুমি আলোকের বুদ্‌বুদ, আমি জলের বুদ্‌বুদ। তুমি ফুটিয়াছ অফুরন্ত আকাশের অজ্ঞেয় উচ্ছ্বাসে—শূন্যের কোলে; আমি জাগিয়াছি পরিপূর্ণ বিশ্বের জমাটবাঁধা বেদনার তরঙ্গের কল্লোলে। তুমি হাসি, আমি রোদন। আমি আমার সারা অঙ্গে তোমাকে জড়াইয়া ধরি, আর রূপের চঞ্চল চমকে দহিয়া মরি; সহমরণে তুমিও মর, আমিও মরি।

উদ্বুদ্ধ

আমি জাগিয়াছি, তুমি নিদ্রিত; আমি চেতন, তুমি অচেতন। আমার কর্ম, আমার সাধনা—আমি তোমাকে জাগাইতে চাই। হাহাকারের ধ্বনিতে, অধীর সঙ্গীতে, আগ্রহের তাড়নায় তোমায় নিরন্তর ডাকিতেছি; কিন্তু হে সঙ্গী, হে অঙ্গীভূত, তুমি জাগিলে না। তোমার অটল জড়ময় আঘাতে আমার সংজ্ঞাময় জীবন-লীলা বাড়িতেছে, কিন্তু তুমি বাড়িলে না, তুমি জাগিলে না—তুমি রহিলে নিস্পন্দ, নীরব। হে স্তব্ধ! হে তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ জীবনের অবলম্বন! তুমি কি জড়, না, চেতনার অতীত বৈরাগ্য? হে কর্ম-সাগরে শায়িত শান্তি! তুমি কি একবার চঞ্চল হইয়া জাগিবে না?

যজ্ঞান্তে

উষার সঙ্কল্প, অরুণের উদ্বোধন ও প্রভাতের উৎসব, দ্বিপ্রহরের উগ্রতাতে রুদ্রযজ্ঞে জ্বলিয়া উঠিল, আর সেই যজ্ঞের আগুন অপরাহ্নের অবসাদে ধোঁয়াইয়া সন্ধ্যার শীতল ছায়ায় ভস্ম হইয়া পড়িল। হে যজ্ঞ-শালার পুরোহিত! রাত্রি আসিয়াছে।

জীবন

তুমি জড়ের গহ্বর ভেদিয়া উঠিলে,—জীবন হইয়া ফুটিলে, বাড়িয়া চলিলে ও বাড়িয়া চলিতেছ। তোমার এই বৃদ্ধিতে ও বিকাশে সংজ্ঞাময় অনুভূতি নাই; এই অনুভূতিহীন বিকাশের গতির নাম—স্ফুরণ—স্ফূর্তি, আনন্দ। তুমি চারিপাশের প্রকৃতিকে অঙ্গীভূত করিয়া বাড়িলে; দুঃখ আসিয়া তোমাকে চাপিয়া ধরিল, অঙ্গে-অঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট হইল, আর তোমার জীবনের উৎসবের জন্য তুমি পাইলে বেদনা—চৈতন্য—সংজ্ঞা। দুঃখ তোমাকে দমাইয়া দিয়া ক্ষয়ের পথে টানিতেছে; আর তুমি সেই ক্ষয় এড়াইয়া যেটুকু বাড়িয়া চলিয়াছ, তাহার নাম সুখ। তোমার আনন্দের আয়তনে দুঃখের হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণে তোমার সুখ পরিমিত হইতেছে। তোমার বিকাশ চলিয়াছে ক্ষয়কে এড়াইয়া; এই বিকাশের প্রসার কতদূর? দুঃখহীনতা চৈতন্যহীন জড়ত্ব; তাই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের স্থিতিতে সংজ্ঞা নাই—সুখ নাই,—আছে কেবল জড়ত্ব। হে অজড়! তোমার অক্ষয় রাজ্যে দুঃখ-নিবৃত্তি কোথায়? সুখ কোথায়?

প্রতিধ্বনি

এ প্রতিধ্বনি দেশ-বিদেশের নয়,—অন্তরের; ঈশ ও উর্জের—আশ্বিন ও কার্তিকের মণ্ডপের দুয়ারে শরতের মৃদু পাদক্ষেপে জাগা মানস প্রতিধ্বনি।

বসন্তের নব চেতনার চঞ্চলতা নাই, নিদাঘের দীপ্ত বেদনার তাপ

নাই। বর্ষার ক্ষিপ্ত কামনার গর্জন ও প্লাবন নাই ; আছ তুমি আমার মানস-প্রাঙ্গনে—অকম্পিত আলোকে ভাস্বর, অপরাজিত আনন্দে সমাহিত ; রসের পুষ্টিতে নয়, স্পর্শের তুষ্টিতে নয়, মদনীয় গন্ধের জড়িমায় নয়, শব্দের মাধুরীর গরিমায় নয়,—কেবল রূপে—অনুভূত উৎসব-সৌন্দর্য্যে তোমাকে অপলক দৃষ্টিতে দেখিতেছি। এস রূপ ! এস শরৎ !

তোমাকে তরুণ জীবনে দেখিয়াছিলাম উজ্জয়িনীর ফ্রেমে বাঁধা কৃত্রিম চিত্রপটে,—কাশাংশুকাবিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা নববধূর বেশে ; দেখিয়াছিলাম বাসন্তী প্রতিমার সহিত অভেদে—হস্তে-লীলাকমলমলকং বালকুন্দানুবিদ্ধম্। তাহার পর দেখিয়াছিলাম কৃত্রিম পট ফেলিয়া প্রাকৃত পটে—তমালতালী-বনরাজী-নীলা সাগর-বেলায়। আর দেখিয়াছি প্রভাতে তুষার-ধবল গিরিশৃঙ্গে, মধ্যাহ্নে বিজন কাননের উপকূলে স্বচ্ছ সরোবরের তীরে ও নিশীথে নক্ষত্রখচিত গাঢ় নীল আকাশে। এখন দেখিতেছি—পটে নয়—ঘটে। নববধূ নও, প্রমদা নও, তুমি এখন মাতৃ-মূর্তিতে উদ্ভাসিত। ক্ষুদ্র ঘটে অসীমের আভাস স্পন্দিত হইতেছে—দৃষ্টি পরাভূত হইয়াছে, আর অফুরন্ত চেতনার উন্মেষে ধ্বনিত হইতেছে।

তমসো মা জ্যোতির্গময়

তোমার অনন্তে প্রসারিত আলোকের ঊর্দ্ধ পথে আমার নিজের হাতের জ্বালা ক্ষুদ্র প্রদীপটি আকাশ-প্রদীপ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছি। এ প্রদীপটি কি দূর পথের নক্ষত্র-লোকে উপহসিত? এই অসীম লোকে কোন্ দিক্‌টি অধিকতর উচ্চে ? অই নক্ষত্রের দিক্ না আমাদের দিক্ ? হে আনন্দ! হে উৎসব! হে রূপ! তোমাকে এই ক্ষীণ

প্রদীপের আলোকে দেখিব—সে তোমার অসীমে পরাভূত হইলেও দেখিব। তমসো মা জ্যোতির্গময়।

ভবিষ্যৎ

এই যে অনুভূতি তিলে-তিলে বাহিরকে অন্তরে টানিতেছে, আর সেই টানে আপনার প্রগাঢ়তা ও অন্তরের নিগূঢ়তা বাড়াইতেছে, একি সময় ও কালের নিত্য সহচর? একি বিদ্যুৎগর্ভ স্ফোটকের মত আমার জীর্ণতার পরিসরে নূতন সৃষ্টির নূতন পরমাণু হইয়া বিকশিত হইতেছে? আমি কি নূতন সৃষ্টির নববিকশিত উপাদান?

করুণার বেদনায় ও অনুরাগের সাধনায় যত প্রাণ আমার প্রাণের আয়তনে আকৃষ্ট হইতেছে,—যাহাদিগকে বেড়িয়া আমি ঘুরিতেছি, আর যাহারা যুগপৎ আমাকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে, তাহারা কি নূতন নিয়ন্ত্রিত একগাছি মালার মণিমুক্তার মত সুসজ্জ হইবে?

বুঝি বা সূতার একটা তার সকল নিবেদন, সম্ভাষণ ও চুম্বনের তলায়-তলায় ছিল; সে সূতা সকলকে গলায়-গলায় জড়াইয়া,—অখণ্ড মালায় সাজাইয়া নূতন সৃষ্টির নূতন কেন্দ্রের চারিদিকে প্রভা বিকীর্ণ করিয়া ঘুরিবে! হে ভবিষ্যৎ, আমি কি তোমার অফুরন্ত অঙ্গের সজাগ উপাদান?

ঘর

নওগো দূরের পথের যাত্রী;—কিসের তরে ডর?
নাইক ডাগর সাগর পাড়ি,—কাছের গোড়ায় তোদের বাড়ী;
তেপান্তরের পারেতে নয়,—বুকের ডাঙ্গার পর।
